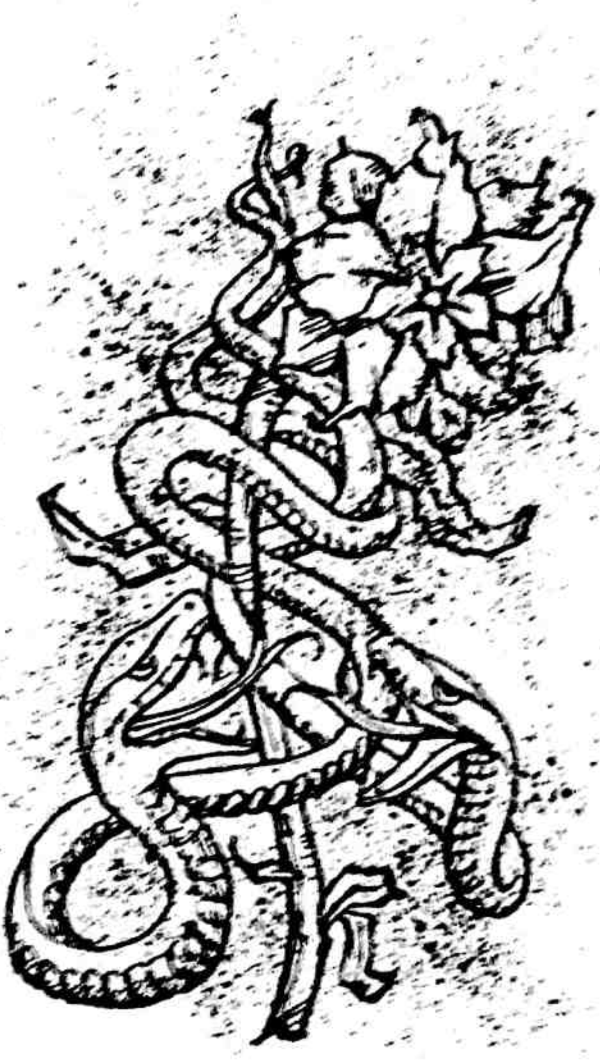


তুমি পিশাচ

॥ এক ॥

আমার চলার কোনও শেষ নেই। আমি সত্যিকারের পথিক—পথই যার জীবন। আমার চলার পথের যেমন কোনও শেষ নেই, তেমন আমারও কোনও শেষ নেই। এমনই আমার জীবন।

মানুষের সঙ্গে আমার মিল অনেক—কিন্তু আবার গরমিলও প্রচুর। আমি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারি। তাই বুঝতে পারি মানুষ কেমন হয়। অর্থাৎ, মানুষের মন আর চেহারা দুই-ই দেখতে পাই। কিন্তু আমাকে কেউ দেখতে পায় না—শুধু অনুভব করতে পারে।

মানুষ আমার খুব পছন্দের, খুব প্রিয়। তাই মানুষ দেখলে আমি কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ি। এক অদ্ভুত টানে দু, তিন, কিংবা চার টুকরো হয়ে নানান মানুষের ভেতরে আশ্রয় নিই। তাই আমার বাসা হল মানুষ—মানুষই আমার ঠিকানা। কারও মধ্যে আমি পঞ্চাশ, ষাট কি একশো বছর ধরে থাকি। আবার কারও শরীরে থাকি পাঁচ, সাত কি দশ দিন। কতদিন কোথায় থাকব সেটা নির্ভর করে আমার মরজির ওপরে।

যে-যে মানুষের মধ্যে আমি আশ্রয় নিই তাদের মধ্যে অনেকগুলো নতুন-নতুন গুণ দেখা যায়। কিন্তু সেই গুণগুলো হয়তো মানুষের চোখে দোষ। তাই আমি খুব চেষ্টা করি গুণগুলো আড়াল করে রাখতে।

কী আশ্চর্য আমার জীবন! মানুষের এত কাছাকাছি আমি বাস করি অথচ তা সত্ত্বেও মানুষ আমাকে ভাবে অমানুষ। আমাকে কিছুতেই আপন করে নিতে পারে না।

আমি জানি, এক ঠান্ডা গভীর অন্ধকার থেকে আমার উৎপত্তি। তারপর পথ চলা। শুধু পথ চলা। আমার বিনাশ বলে কিছু নেই। মানুষ আমাকে

কখনও-কখনও ধ্বংস করে বটে, কিন্তু তা নিতান্তই সাময়িক। তখন আমি ফিরে যাই সেই ঠান্ডা অন্ধকার গহ্বরে। শীতঘুমে সময় কাটিয়ে দিই। তারপর...।

তারপর? তারপর যখন আবার খিদে টের পাই, তেষ্টা টের পাই, মানুষের টান টের পাই—তখন আমি জেগে উঠি। শীতঘুম ছেড়ে বেরিয়ে আসি বাইরের আলোর জগতে, লোকালয়ে। যেমন এখন।

ওই তো চোখে পড়ছে একটা বিশাল পাঁচিল ঘেরা এলাকা। তার ভেতরে, অনেকটা দূরে, একটা বাড়ি। বাড়ি তো নয়, যেন প্রাসাদ। না, শুধু প্রাসাদও নয়—তার সঙ্গে রয়েছে ছোট-ছোট কয়েকটা বাড়ি আর ঘিরে থাকা বাগান। বাগানে কত বড়-বড় গাছ। গাছে কত পাতা। সেই পাতার ছায়ায় গাছের নীচটা দিনের আলোতেও অন্ধকার-অন্ধকার দেখাচ্ছে। আর সেই অন্ধকারে মাথাচাড়া দিয়েছে অজস্র আগাছা।

প্রকাণ্ড এলাকাটা রং-চটে-যাওয়া পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তারই এক জায়গায় সিং-দরজা। সব কিছু দেখে মনে হয় রাজারাজড়াদের ফেলে যাওয়া বাগান আর প্রাসাদ। এককালে তাদের হাতিশালে হাতি ছিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া। আজ সবই পুরোনো স্মৃতি। শুধু রাজবাড়িটা অতীতের সাক্ষী হয়ে চুপচাপ মনের দুঃখে দাঁড়িয়ে আছে। আর তাকে ঘিরে বিষণ্ণ গাছগুলো।

কিন্তু তাই কী? এখানে এখন কেউ থাকে না তা তো নয়!

কারণ, আমি মানুষের ঘ্রাণ পাচ্ছি। একটা-আধটা নয়, অনেক মানুষের।

শুধু তাই নয়, এত দূর থেকেও আমি কত মানুষের কথা শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি ছেলেদের গলা, মেয়েদের গলা।

উঁহু, বাড়িটা পুরোনো জীর্ণ হলেও এখানে অনেক মানুষ থাকে। আমাকে ওরা কোন অদৃশ্য টানে টানছে—কাছে টানছে।

আমি আকাশের দিকে তাকালাম।

আকাশে মেঘ জড়ো হচ্ছিল সকাল থেকেই। তার সঙ্গে দম আটকানো গুমোট। বৃষ্টি যে হবে তার গন্ধ আমি পাচ্ছিলাম। এও বুঝতে পারছিলাম, মেঘ আরও ঘন হবে, আরও কালো হবে। এখন দেখলাম আকাশটা একেবারে ছাই রঙের হয়ে গেছে। আর সেই রং-টা ক্রমশ কালোর দিকে

ঢলে পড়ছে।

বৃষ্টির জল আমার ভালো লাগে না। বৃষ্টির জল ওপর থেকে আসে। প্রাকৃতিক পবিত্র জল। ওই জল গায়ে লাগলে আমরা—মানে, আমি আর আমার মতো যারা—নিস্তেজ হয়ে পড়ি। তাই ঠিক করলাম, আপাতত এই বাড়িটায় আমি আশ্রয় নিই। অনেক মানুষে ভরা এই আস্তানাটা আমার মন্দ লাগবে না।

সেদিকে এগোতে গিয়েই সিং-দরজার মাথায় বসানো হোর্ডিং-টা আমার চোখে পড়ল। তাতে বড়-বড় হরফে লেখা রয়েছে ঃ

রাজা চন্দ্রভানু মালটিপারপাস গার্ল্‌স স্কুল

ও, এটা তা হলে স্কুল!

ওঃ, ক'শো বছর আগে যে আমি স্কুলে পড়তে গিয়েছিলাম তা মনে নেই। কিন্তু যুগে-যুগে আমি মানুষের কাছ থেকে শিখেছি। যখনই আমি কোনও মানুষের শরীর আর মন দখল করেছি তখনই তার সব অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান আমার অস্তিত্বে মিশে গেছে। আমি বহু শতকের প্রাচীন হলেও সবসময় নবীনের কাছাকাছি থেকে শিখেছি। তাই প্রাচীন হলেও আমি সবসময় আধুনিক।

এখনও চিনতে পারোনি আমাকে?

আমি একজন পিশাচ—যার মধ্যে রয়েছে অতি প্রাচীন এক অমানুষ প্রেতাত্মা।

আমি একা। তবে ইচ্ছে হলেই অনেক হতে পারি—অ্যামিবার মতো।

আর যদি আমি তোমার ওপরে ভর করি, তোমার মধ্যে বাসা বাঁধি, তা হলে তখন তুমি পিশাচ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুমি।

আকাশ থেকে বৃষ্টির দু-একটা ফোঁটা পড়ল।

নাঃ, আর দেরি নয়। আমি সিং-দরজার দিকে এগোলাম। তালাবন্ধ দরজার জং ধরা লোহার রডের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। দারোয়ানরা কেউ আমাকে দেখতে পেল না—কারণ, আগেই বলেছি, আমাকে দেখা যায় না—শুধু টের পাওয়া যায়।

সুন্দর পিচবাঁধানো রাস্তা আর ঘাসজমির ওপর দিয়ে প্রাচীন বাড়িটার

দিকে যাওয়ার সময় আমি হঠাৎই একটা চেনা গন্ধ পেলাম। স্কুলবাড়ির দিক থেকেই আসছে গন্ধটা।

চমকে উঠলাম আমি। এ তো আমার মতোই গন্ধ! আমার একজন বন্ধু তা হলে রয়েছে ওই স্কুলবাড়িতে! আমার আগেই আমার মতো কেউ এসে আশ্রয় নিয়েছে এখানে! অথবা আস্তানা গেড়েছে ওই বাড়ির মানুষজনের ভেতরে! আনন্দ আর খুশিতে মনটা নেচে উঠল।

বৃষ্টির ফোঁটা হঠাৎই জোরে ঝরতে লাগল।

আর আমিও দেরি না করে ঢুকে পড়লাম স্কুলবাড়ির ভেতরে।

॥ দুই॥

ইতিহাসের ক্লাস এমনভাবে চলছিল যেন টিভির নিউজ চ্যানেলে কোনও রোবট পরপর দুঃখের খবর পড়ে চলেছে।

রনিতা ম্যাডাম এভাবেই ক্লাস নেন বরাবর। আর সেই জন্যই পড়ার দিকে ইলিনার মন ছিল না। ও অনুষ্কার কথা ভাবছিল। মাত্র সাতদিন হল অনুষ্কা ওদের ক্লাসে ভরতি হয়েছে।

ইলিনার ডেস্কের ওপরে ইতিহাস বইয়ের পাতা খোলা ছিল। তার নীচে একটা রাফ খাতা। সেই খাতার শেষ পাতায় ইলিনা বারবার নিজের নাম লিখছিল। একবার ইংরেজিতে, আর-একবার বাংলায়। বেশ সুন্দর ডিজাইন করে অক্ষরগুলো তৈরি করছিল ও। সেগুলোর দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায় ওর অলঙ্করণের হাত বেশ ভালো।

ইলিনার খুব শখ ও ট্যাটু আর্টিস্ট হবে। এ পর্যন্ত ও প্রায় চল্লিশটা ট্যাটুর ডিজাইন এঁকেছে—লাল আর নীল কালি দিয়ে। সেগুলো একটা বাঁধানো ড্রইং খাতায় আঁকা আছে। সেটার ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে ওর নিত্য-নতুন নকশার আইডিয়া মাথায় আসে।

মাঝে-মাঝে ও বন্ধুদের হাতে বা পায়ে বলপয়েন্ট পেন দিয়ে ছোট-ছোট ট্যাটু এঁকে দেয়। অবশ্য বন্ধুদের পারমিশান নিয়ে তবেই। একবার গীতাঞ্জলির কনুইয়ের ওপরদিকটায় একটা বাজপাখির ডিজাইন এঁকে দিয়েছিল। সেটা রনিতা ম্যাডামের চোখে পড়ে গিয়েছিল। গীতাঞ্জলিকে তিনি বেশ বকুনি দিয়েছিলেন। কিন্তু গীতাঞ্জলি ইলিনার নাম বলেনি। বরং ট্যাটু আঁকার দায়টা ওর এক কাল্পনিক ভাইয়ের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছিল।

ইলিনার নামের অক্ষরের ডিজাইনগুলো অনেকটা ট্যাটুর ডিজাইনের মতো দেখাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে ইলিনা সেগুলো বেশ খুঁটিয়ে বিচার

করছিল। হঠাৎই ক্লাসরুমের খোলা জানলায় একটা শালিখ এসে বসায় ওর সেদিকে চোখ গেল।

ক্লাসরুমের বাইরের দিকের দেওয়ালে দুটো বড়-বড় জানলা। তাতে ঝিলমিল লাগানো বিশাল পাল্লা। পাল্লার ওপরে ফুটদুয়েক চওড়া ঝিলমিল বসানো কাঠের পাটি। বহু পুরোনো আমলের রাজা-রাজড়াদের বাড়িতে যেমন থাকত। রাজা চন্দ্রভানুও বোধহয় সেরকম কেউকেটা কোনও রাজা কিংবা মহারাজা ছিলেন। তাঁর সেই রাজপ্রাসাদ প্রায় একশো বছর আগে স্কুল হয়ে গেছে।

শালিখ দেখতে গিয়ে ইলিনার চোখ গেল অনুষ্কার দিকে। মনে হল, ইলিনার মতো ওরও ইতিহাসে মন নেই, আর ও-ও যেন আনমনাভাবে খাতায় আঁকিবুকি কেটে চলেছে।

অনুষ্কাকে কেমন অদ্ভুত বলে মনে হয় ইলিনার। মাত্র সাতদিন আগে মেয়েটা ক্লাস টেন-এ ওদের সেকশানে এসে ভরতি হয়েছে। ওর বাবা সরকারি চাকরি করেন। ঝাড়খণ্ড থেকে ট্রান্সফার হয়ে কলকাতায় এসে পড়েছেন। তাই অনুষ্কা এই স্কুলে ভরতি হতে পেরেছে। নইলে ইলিনাদের স্কুলে ক্লাস টেন-এ কাউকে ভরতি নেওয়া হয় না।

অনুষ্কাকে দেখতে খুব সুন্দর। এত সুন্দর যে, অন্য মেয়েরা যখন-তখন ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ইলিনার খুব বিশ্বাস, কোনও ফিল্ম ডিরেক্টর ওকে দেখামাত্র সিনেমা কি টিভি-তে চান্স দিয়ে দেবে।

রনিতা ম্যাডাম আনমনা অনুষ্কাকে খেয়াল করেছিলেন। তাই ওকে 'শিক্ষা' দেওয়ার জন্য ওর দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'অনুষ্কা, তুমি বলো....।'

অনুষ্কা শান্তভাবে উঠে দাঁড়াল। নিষ্পাপ ফুটফুটে মুখে তাকাল ম্যাডামের দিকে।

রনিতা ম্যাডাম ক্লাস নাইন-এর কয়েকটা চ্যাপ্টার রিভাইজ করাচ্ছিলেন। তাই সম্রাট অশোকের ধর্মের বিষয়ে পড়াচ্ছিলেন।

অনুষ্কাকে রনিতা ম্যাডাম জিগ্যেস করলেন, 'সম্রাট অশোক যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তার সূক্ষ্ম তফাত কোথায় ছিল?'

রনিতা ম্যাডামের রোগা চেহারা। চশমার পিছনে চোখ দুটো বেশ রাগী। কপালে ভাঁজ। সবসময় ছাত্রীদের হেনস্থা করেন, শাস্তি দেওয়ার

ফিকির খোঁজেন।

ইলিনা বুঝল, আজ অনুষ্কার রেহাই নেই। কপালে চূড়ান্ত বকুনি আছে। তারপর, যদি কপাল আরও খারাপ হয়, তা হলে ক্লাস সিক্সের রুমের সামনে গিয়ে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

ইলিনার বুকের ভেতরটা অকারণেই ঢিপঢিপ করতে লাগল। ও স্থির চোখে অনুষ্কার দিকে তাকিয়ে রইল। অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু কী আশ্চর্য!

অনুষ্কা মিষ্টি গলায় ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'ম্যাডাম, বৌদ্ধধর্মের তুলনায় অশোকের প্রচার করা ধর্ম অনেক বেশি উদার আর মানবতাবাদী ছিল। অশোক তাঁর ধর্মে ব্যক্তিগত জীবন আর সমাজজীবনকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সেই কারণেই তিনি দান, দয়া প্রভৃতি বারোটি গুণের অনুশীলন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রচলিত ধর্মে নানা ধর্মের সার কথাগুলো জায়গা পেয়েছিল...।'

রনিতা ম্যাডাম কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। শিকার হাতছাড়া হওয়ার দুঃখের চেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটাই বেশি করে ফুটে উঠল ওঁর মুখে। তিনি স্পষ্ট দেখেছেন, মেয়েটা অন্যমনস্ক হয়ে খাতায় কী যেন করছিল। তা হলে কী করে ওঁর এইমাত্র পড়ানো লাইনগুলো হুবহু বলে দিল!

অনুষ্কা কি ওঁর বলা কথাগুলো খাতায় টুকছিল? তারপর প্রশ্নের উত্তরে সেই লেখাগুলোই রিডিং পড়ে দিল?

কিন্তু উত্তর দেওয়ার সময় মেয়েটা তো খাতার দিকে তাকায়নি!

মরিয়া হয়ে ডায়াস থেকে নেমে এলেন রনিতা ম্যাডাম। মেয়েটার খাতাটা একবার দেখা দরকার।

'দেখি, তোমার খাতাটা দেখি—।' চটপটে পায়ে জানলার পাশ দিয়ে হেঁটে অনুষ্কার কাছে চলে এলেন।

অনুষ্কা কোনও কথা না বলে ডেস্কের ওপরে রাখা খোলা খাতাটা দিদিমণির দিকে এগিয়ে দিল।

রনিতা ম্যাডাম দেখলেন। পাতা দুটোয় কিছু লেখা নেই। শুধু ডানদিকের পাতার নীচের কোনার দিকে কয়েকটা হিজিবিজি দাগ।

খাতাটা ওকে ফেরত দিয়ে সামান্য ধমকের সুরে 'বোসো' বলে

ডায়াসের দিকে ফিরে গেলেন। ওঁর ফিরে যাওয়ার ভঙ্গিতে কেমন যেন একটা 'হেরে যাওয়া' ভাব ছিল।

ইলিনার খুব আনন্দ হচ্ছিল। ওর মনে হল অনুষ্কা যেন রনিতা ম্যাডামকে পালটা একটা 'শিক্ষা' দিল। অনুষ্কাকে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করল ওর। ওর সঙ্গে জমিয়ে গল্প করতেও ইচ্ছে করল।

কিন্তু সেটা বোধহয় সম্ভব নয়। কারণ, প্রথম দিন থেকেই ইলিনা লক্ষ করেছে, অনুষ্কা ভীষণ একা-একা আর চুপচাপ থাকে—কারও সঙ্গে মিশতে চায় না। ইলিনা দু-একবার আলাপ জমানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কথাবার্তা তেমন এগোয়নি।

রনিতা ম্যাডাম মঞ্চে উঠে আবার পড়াতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু ওঁর যান্ত্রিক আত্মবিশ্বাসে কেমন যেন চিড় ধরে গিয়েছিল। তাই পড়ানোর তাল আর লয় বারবার গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

ইলিনা ভাবছিল, পিরিয়ডটা শেষ হলে বাঁচি। কারণ, তারপরই টিফিন। তখন অন্তত আধঘণ্টা হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যাবে।

আজ ওর পড়াশোনার মুড নেই। শুধু গল্প করতে ইচ্ছে করছে আর গান শুনতে ইচ্ছে করছে। কে জানে কেন—হয়তো আকাশটা মেঘলা বলেই। আর তার সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি মনখারাপের ইন্ধন জোগাচ্ছে।

হঠাৎই টিফিনের ঘণ্টা পড়ল। টিফিনের ঘণ্টার একটা বিশেষ ঢং আছে। ছুটির ঘণ্টারও তাই। ঠিক ফুটবল খেলায় হাফটাইম আর গোলের বাঁশি বাজানোয় যেমন তফাত থাকে।

ওদের স্কুলের ঘণ্টাটা দারুণ। একতলার বারান্দায় সিলিং থেকে ঝোলানো বড় পিতলের ঘণ্টা—ঠিক পূর্ণিমার চাঁদের মতো। বৃদ্ধ বলাইদা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে সেই ঘণ্টাটা টাইমে-টাইমে বাজিয়ে দেয়।

টিফিন হতেই গোটা ক্লাসটা স্বাধীন এবং এলোমেলো হয়ে গেল। কেউ-কেউ জানলার কাছে চলে গেল। আকাশ, বৃষ্টি আর গাছপালা দেখতে লাগল। বেশ কয়েকজন মেয়ে স্কুলব্যাগ থেকে টিফিনবক্স বের করে টিফিন খেতে বসল।

আজ বৃষ্টির মধ্যে অন্য দিনের মতো একতলার উঠোনে কিংবা বাগানে গিয়ে ছুটোছুটি করে খেলার উপায় নেই। তাই অনেকে ক্লাসরুমের লাগোয়া করিডরে গিয়ে হইহল্লোড় করতে লাগল।

ইলিনা টিফিনবক্সটা ব্যাগ থেকে বের করে নিল। তারপর তাকাল অনুষ্কার দিকে।

অনুষ্কা একটা খাতা খুলে তাতে মনোযোগ দিয়ে কী যেন লিখছিল। ওর দু-পাশে পারমিতা আর সুচন্দ্রা বসে। এখন ওরা কেউ সিটে নেই। বোধহয় টিফিন খেতে বাইরের করিডরে কোথাও গেছে।

ইলিনার কেমন একটা জেদ চেপে গেল। আজ ও অনুষ্কার সঙ্গে আলাপ করবেই। গায়ে পড়ে হলেও ওর সঙ্গে আজ আলাপ করতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।

তাই ইচ্ছে আর জেদ সঙ্গী করে ও সরাসরি অনুষ্কার কাছে চলে গেল। ওর ডানপাশের খালি চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ে বলল, 'কী করছ?'

অনুষ্কা চোখ তুলে তাকাল ইলিনার দিকে।

কী সুন্দর গভীর দুটো চোখ! টানা-টানা, ঘন চোখের পাতার সীমানায় ঘেরা। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় কাজল পরে এসেছে। ওর চোখের মণির ভেতরে চক্রের মতো অনেকগুলো বৃত্ত। সেগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় বৃত্তগুলো কোন পাতালে চলে গেছে।

'একা-একা বসে কী করছ?' ইলিনা আবার জিগ্যেস করল।

'কিছু না।' নীচু গলায় অনুষ্কা বলল।

ওর খাতার দিকে চোখ গেল ইলিনার। সেখানে অদ্ভুত একটা ছবি বারবার আঁকা—ছোট-বড় নানান মাপে। একটা ফুলকে ঘিরে দুটো সাপ—তাদের লেজের কাছটা একে অপরের সঙ্গে জড়ানো।

দেখে কোনও একটা প্রতীকচিহ্ন গোছের ছবি বলে মনে হয়। অথবা কোনও ট্যাটুর নকশা।

'এটা কীসের ছবি?' ছবিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে জানতে চাইল।

'ও কিছু না....।'

'দারুণ হয়েছে কিন্তু। অনেকটা ট্যাটুর ডিজাইনের মতো। তুমি তো জানো আমি ট্যাটুর ডিজাইন আঁকি। খাতাটা পরে আমাকে দিয়ো—আমি ডিজাইনটা তুলে নেব।'

কথাটা শুনেই শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল অনুষ্কা। কেমন একটা

ভয়ের চোখে তাকাল ইলিনার দিকে : 'না, না—এটা বাজে ছবি। এটার কোনও মানে হয় না। ওয়ার্থলেস—।'

এ-কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে অনুষ্কা ছবিগুলোর ওপরে এলোমেলো কাটাকুটি দাগ আঁকতে লাগল। ছবিগুলো নিপুণভাবে নষ্ট করতে লাগল।

'কী করছ! কী করছ! সুন্দর ছবিগুলো নষ্ট করছ কেন?'

কিন্তু অনুষ্কা ইলিনার কথায় মোটেই কান দিল না। কাটাকুটি দাগ কাটতে-কাটতেই বিড়বিড় করে বলল, 'সুন্দর নয়, বাজে ছবি....বাজে ছবি...।'

ইলিনা কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ওর আলাপের শুরুটা এভাবে ধাক্কা খাবে ও ভাবেনি।

প্রসঙ্গ পালটাতে ও টিফিনবক্স খুলে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে ফ্রেঞ্চ টোস্টের জিভে-জল-আনা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। মা-মণি টিফিনবক্সে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে। একটা খোপে চার পিস ফ্রেঞ্চ টোস্ট। তার পাশের খোপে একটা মিষ্টি। আর একটা ছোট পলিপ্যাকে টমেটো সস।

'এসো, আমার টিফিন শেয়ার করো....।'

'টিফিন?' খানিক যেন দিশেহারা হয়ে ইলিনার দিকে তাকাল অনুষ্কা : 'টিফিন তো আমার খাওয়া হয়ে গেছে....।'

ইলিনা বেশ অবাক হয়ে গেল। স্কুল বসেছে সকাল এগারোটায়। তারপর, চারটে পিরিয়ড শেষ হলে এই টিফিন ব্রেক। সুতরাং টিফিন ব্রেকের আগে টিফিন খাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। তাহলে অনুষ্কা এসব কী বলছে? ওর টিফিন খাওয়া হয়ে গেছে!

'কখন টিফিন খেলে তুমি! আমাকে এত বোকা পেয়েছ!' বন্ধুত্বে ভরা মজার সুরে বলল ইলিনা, 'নাও, ফ্রেঞ্চ টোস্ট খাও! আমার মা-মণি ভেজে দিয়েছে—।'

'না, মানে....আমার ঠিক খিদে নেই।' নরম গলায় বলল, 'প্লিজ, তুমি কিছু মাইন্ড কোরো না....।'

অনুষ্কার মিষ্টি মুখে কাতর এক অনুনয় ফুটে উঠেছিল। সেদিকে তাকিয়ে ইলিনা আর কিছু বলতে পারল না। তবে একইসঙ্গে ওর মনে পড়ল এই ছ'দিনে অনুষ্কাকে ও কোনওদিনও টিফিন খেতে দেখেনি।

অর্থাৎ, অনুষ্কা টিফিন খাচ্ছে এমন দৃশ্য ওর চোখে পড়েনি।

মুহূর্তের মধ্যে খটকাটা ডিঙিয়ে ও ফ্রেঞ্চ টোস্ট টমেটো সস-এ ছুঁইয়ে কামড় বসাল। খেতে-খেতে প্রসঙ্গ পালটে চলে গেল রনিতা ম্যাডামের দিকে।

'রনিতা ম্যাডামকে তুমি আজ দারুণ টাইট দিয়েছ। আমি ভাবতেই পারিনি তুমি ওই সাডেন অ্যাটাকের মুখে ওরকম ঠিক-ঠিক আনসার দিতে পারবে....।'

'উঁ।' বলে ছোট্ট একটা শব্দ করল অনুষ্কা।

'কী করে পারলে বলো তো।' ইলিনা বলেই চলল, 'ফ্যানট্যাস্টিক! তুমি যে ক্লাসে এত মনোযোগ দিয়ে শোনো সেটা তোমাকে দেখে কিন্তু বোঝা যায় না....।'

অনুষ্কা শান্ত চোখে তাকাল ইলিনার দিকে। বলল, 'মনোযোগ দিতে হয় না। আমাদের এমনিতেই সব মনে থাকে....।'

ইলিনা ফ্রেঞ্চ টোস্টে কামড় দিতে গিয়ে থমকে গেল।

'আমাদের এমনিতেই সব মনে থাকে' মানে?

সে-কথাই ও জিগ্যেস করল, '"আমাদের" বলছ কেন? আমাদের মানে?'

চমকে উঠল অনুষ্কা। তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বলল, 'আমাদের মানে আমার। আমার এমনিতেই সব মনে থাকে....।' কথা শেষ করে হাসল।

ইলিনা অবাক চোখে অনুষ্কার দিকে তাকিয়ে রইল। একে তো অপরূপ সুন্দরী, তার ওপর এত গুণ! বাব্বাঃ! এমনিতেই সব মনে থাকে!

ভগবানের ওপরে রাগ হল ইলিনার। একজনকে উজাড় করে সবকিছু দেওয়ার কী দরকার ছিল? মনে থাকার ব্যাপারটা তিনি যদি কাইন্ডলি ইলিনাকে দিতেন তা হলে পরীক্ষার রেজাল্টটা অনেক ভালো হতে পারত। বাপি আর মা-মণির কাছ থেকে রেগুলার বকাবকি শুনতে হত না।

জানলার ফ্রেমে বাঁধানো আকাশটা আরও কালো হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যুৎ সেই কালোর ওপরে মাঝে-মাঝেই সাদা তরোয়াল ঘোরাচ্ছিল।

ইলিনা সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখবে, ছুটির সময় ঠিক বৃষ্টি হবে। তুমি ছাতা এনেছ তো? আমি এনেছি....।'

অনুষ্কা হাসল ঃ 'হ্যাঁ, এনেছি। ছাতা ছাড়া আমি চলতেই পারি না। তা ছাড়া বৃষ্টি আমার একদম ভালো লাগে না....।'

'কেন?'

বৃষ্টি পড়ছিল—তবে তেমন জোরে নয়। সেদিকে অপছন্দের চোখে তাকাল অনুষ্কা। বলল, 'পরিবেশবিদরা বলেন, বৃষ্টির জলে অ্যাসিড থাকে....।'

'যাঃ, সে তো রেয়ার! তোমার এটা ভুল ধারণা—।'

'ভুল ধারণা হোক আর যা-ই হোক, বৃষ্টি আমার ভাল্লাগে না...।'

মেঘের গর্জন শোনা গেল আকাশে।

॥ তিন ॥

স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশান আর বেশি দূরে নেই—মাত্র দু-মাস বাকি। নাচ, গান, আবৃত্তি আর নাটকের রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে। স্কুলের যে-কোনও কালচারাল প্রোগ্রামে শম্পা ম্যাডাম আর কাকলি ম্যাডাম সবসময় দায়িত্ব নেন।

শম্পা ম্যাডাম বেশ লম্বা, খুব সুন্দর নাচতে পারেন। আর সবসময় মুখে হাসি।

কাকলি ম্যাডাম মাথায় খাটো। মোটাসোটা। মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারেন ফাটাফাটি। কিন্তু ওঁর ভীষণ ভূতের ভয়।

ইলিনাদের কালচারাল প্রোগ্রামের রিহার্সাল হয় ফেস্টিভ্যাল হলে। হলটা বিশাল বড়। ওলটানো 'ভি' অক্ষরের মতো টিনের চালে ঢাকা। অনেক সময় ছোটখাটো প্রোগ্রাম হলে এই হলঘরটাতেই সেরে নেওয়া হয়। কিন্তু স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশান মানে ঘ্যাম ব্যাপার। তখন খেলার মাঠে প্রকাণ্ড প্যান্ডেল বাঁধা হয়।

গত বছর ইলিনারা ফেস্টিভ্যাল হলে সন্ধেবেলা গানের রিহার্সাল দিচ্ছিল। কাকলি ম্যাডাম ওদের 'চিত্রাঙ্গদা'-র গানগুলো তোলাচ্ছিলেন। তখন পাশের বাস্কেটবল গ্রাউন্ড থেকে অদ্ভুত এক শব্দ ভেসে এসেছিল।

স্কুলের বাস্কেটবল গ্রাউন্ডটা বড় মাপের, কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো। তার চারপাশটা লোহার জালের উঁচু রেলিং-এ ঘেরা। যখন খেলা-টেলা থাকে না তখন গ্রাউন্ডে ঢোকার লোহার গেটটায় তালা দেওয়া থাকে। সেদিনও তাই ছিল। তবুও সেখান থেকে ভেসে আসছিল খটখট-খটখট শব্দ। যেন অনেকগুলো টগবগে ঘোড়া বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের কংক্রিটের মেঝেতে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে।

এরপর ওদের গানের রিহার্সাল ভন্ডুল হয়ে গিয়েছিল।

ইলিনা স্কুলের কাজের মাসি আশাদির কাছে শুনেছে, এই স্কুলটা নাকি সাহেবি আমলে সৈন্যদের ছাউনি ছিল। স্কুলের বিশাল এলাকার নানান সব বিল্ডিং-এ সৈন্যরা থাকত। আর মেইন স্কুল বিল্ডিংটা ছিল হেস্টিংস সাহেবের কোয়ার্টার। একসময় হেস্টিংস রাজা চন্দ্রভানুকে এই বিশাল সম্পত্তি নামমাত্র দামে বিক্রি করে দেন।

এই স্কুল ক্যাম্পাসে যে সন্ধেবেলা কখনও-সখনও ভূতুড়ে কাণ্ড শুরু হয় এমন দুর্নাম বরাবরই ছিল।

কখনও মাঠের বড়-বড় গাছপালার ফাঁকে আলোর ফুটকি দেখা যায়। সেগুলো খসে পড়া তারার মতো ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

কখনও বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যায়।

একবার ক্লাস টেন-এর একটা মেয়ে দোতলার বারান্দা থেকে আর-একটা মেয়েকে নীচে লাফিয়ে পড়তে দেখেছিল—কিন্তু মেয়েটির পড়ার কোনও শব্দ শোনা যায়নি বা একতলায় ছুটে গিয়ে কোনও বডি পড়ে থাকতে দেখা যায়নি।

কিন্তু এতসব গুজব, রটনা কিংবা দুর্নাম থাকলেও স্কুলটা যে এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তার কারণ পড়াশোনা। মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজা চন্দ্রভানু মালটিপারপাস গার্ল্স স্কুলের রেজাল্ট বরাবরই ঈর্ষা করার মতো।

আজ অ্যানুয়াল ফাংশানের গানের রিহার্সাল চলছিল। কাকলি ম্যাডাম ছ'জনকে একসঙ্গে বসিয়ে একটা গান তোলাচ্ছিলেন। পাশে বসেছিলেন শম্পা ম্যাডাম আর রবিনা ম্যাডাম। রবিনা ম্যাডাম খুব ভালো আবৃত্তি করতে পারেন। ইলিনাদের প্রোগ্রামে সঞ্চালনা আর আবৃত্তির ব্যাপারটা তিনিই দেখাশোনা করেন। ম্যাডামের বয়কাট চুল আর মুখে কয়েকটা বসন্তের দাগ আছে বলে ওঁকে একটু রুক্ষ দেখায়। তবে ওঁর ব্যবহার খুব মিষ্টি আর দারুণ সাহস। একবার নাকি হেডমিসট্রেসের ভূতের ভয় তাড়াতে সন্ধে সাতটার সময় টর্চ ছাড়াই অন্ধকারে গোটা ক্যাম্পাসটা চক্কর দিয়ে এসেছিলেন।

রবিনা ম্যাডাম ইলিনাদের সবসময় বলেন, 'শোন, ভূত বলে কিছু নেই। আসলে তোরাই এক-একটা ভূত।'

তখন ক্লাসের আর-একটি মেয়ে, সজনী, ফোড়ন কেটে বলে উঠেছিল, 'ভূত না, ম্যাডাম—পেতনি...।' তাতে ক্লাসের সবাই হেসে উঠেছিল। আর রবিনা ম্যাডামও হাসি চাপতে পারেননি।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। মেঘও ডাকছিল আপন খেয়ালে। হলের টিনের চালে বৃষ্টির আওয়াজ হচ্ছিল। খোলা জানলা দিয়ে বিদ্যুতের ঝিলিক চোখে পড়ছিল।

হলের মেঝেতে বিশাল মাপের তিনটে শতরঞ্চি পাতা। তার ওপরে সবাই বসেছিল। কাকলি ম্যাডাম ছ'জনকে গান তোলাচ্ছিলেন আর ইলিনারা দশ-বারো জন একটু দূরে বসে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় গল্পগুজব করছিল।

হঠাৎই ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল ওদের। মনে হল, বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের কংক্রিট বাঁধানো চাতালে যেন অনেকগুলো ঘোড়া এলোমেলোভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে।

ইলিনা চমকে উঠল। ওর মনে পড়ল, প্রায় বছরখানেক এই শব্দটা শোনা যায়নি।

শব্দটা যে কাকলি ম্যাডামও শুনতে পেয়েছেন সেটা বোঝা গেল। কারণ, তিনি গান থামিয়ে দিয়েছেন। আশা-আশঙ্কার চোখে রবিনা ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। যেন ভূত তাড়াতে রবিনা ম্যাডামই একমাত্র ভরসা।

ইলিনার পাশে বসে ছিল সমর্পিতা —সম্পি। ওর দশাসই মোটাসোটা চেহারা, আর ডাকাবুকো বলে স্কুলে বেশ খ্যাতি আছে।

সমর্পিতা এমন লম্বা-চওড়া যে, স্কুল-ইউনিফর্ম পরে থাকলেও ওকে ইলিনাদের চেয়ে বয়েসে অনেক বড় বলে মনে হয়। লেখাপড়া ছাড়া অন্য যে-কোনও কাজে ওর উৎসাহ অনেক বেশি। স্কুলের সবরকম অ্যাক্টিভিটিতে সম্পি সবার আগে হাজির। দিদিমণিদের কোনও ব্যক্তিগত কাজের জন্যেও ওর ডাক পড়ে। দিদিরা সবাই ওকে ভালোবাসেন, স্নেহ করেন। আর বন্ধুদের মতো ওর বড় মাপের নামটাকে ছোট করে 'সম্পি' বলে ডাকেন।

ইলিনা সম্পির গায়ে ছোট্ট ঠেলা দিয়ে বলল, 'কী রে, কীসের আওয়াজ?'

সম্পি বলল হাত নেড়ে, 'ছাড় তো, ও কিছু নয়। ওই লাস্ট ইয়ারে

যেমন শোনা গিয়েছিল। তারপর খোঁজ নিয়ে দেখবি হয়তো কাকু কিংবা মাসিদের কোয়ার্টারে কোনও ছেলেপিলে মেঝেতে নারকোলের মালা ঠুকে আওয়াজ করে খেলছে...।'

এটা ঠিকই যে, স্কুলের অনেক কর্মী—বলাইদা কিংবা আশাদির মতো—ক্যাম্পাসের মধ্যেই সংসার নিয়ে কোয়ার্টারে থাকে। টিনের চালে ছাওয়া ছোট-ছোট পাকা ঘরগুলোই ওদের কোয়ার্টার। ওদের কোনও ছেলেমেয়ে এই ভূতুড়ে কাণ্ড করতেই পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইলিনার তেমন ভরসা হচ্ছিল না।

যেন ওকে সাহস দিতেই সমর্পিতা উঠে দাঁড়াল। তারপর গটগট করে পা ফেলে এগিয়ে গেল খোলা জানলার দিকে।

কাকলি ম্যাডাম ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সম্পি, কী করছ! যেয়ো না, যেয়ো না....।'

ম্যাডামের কথা সমর্পিতা শুনল না। জানলার কাছে পৌঁছে গেল। এবং ওর পিছু-পিছু রওনা হল ইলিনা, সজনী আর অঙ্গনা।

ভয় যে ওদের করছিল না তা নয়—কিন্তু কৌতূহলটাও কিছু কম মাথাচাড়া দিচ্ছিল না।

রবিনা ম্যাডামের ভয়-টয়ের কোনও বালাই নেই। তিনিও কখন যেন ইলিনাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অন্য মেয়েরা তখন শতরঞ্চিতে বসে ভয় আর কৌতূহলের চোখে ইলিনাদের দিকে দেখছে।

জানলার বাইরে বৃষ্টি আর অন্ধকার। আকাশে মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক। তারই মধ্যে নজর চালিয়ে সম্পি ব্যাপারটা ভালো করে দেখতে চেষ্টা করল।

বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের দিক থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ আসছে ঠিকই, কিন্তু সাদা আলোর দু-একটা বিন্দুও চোখে পড়ছে যেন। মাপে জোনাকি পোকার মতো, কিন্তু অনেক উজ্জ্বল। বিন্দুগুলো চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক ছিটকে বেড়াচ্ছে।

আকাশে গুড়গুড় শব্দে মেঘ ডাকল। কিন্তু তাতে ঘোড়ার টগবগ শব্দ চাপা পড়ল না।

অঙ্গনা জিগ্যেস করল, 'ওই আলোগুলো কীসের? মনে হচ্ছে কারা যেন মিনি সার্চলাইট জ্বেলেছে।'

একইসঙ্গে ইলিনা টের পেল অঙ্গনা ওর গায়ের কাছে সরে এসেছে।

সমর্পিতা বলল, 'কীসের আলো সেটা গিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।'

কাকলি ম্যাডাম হারমোনিয়ামের কাছে বসেছিলেন। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না, না—যাওয়ার কোনও দরকার নেই। তা ছাড়া বৃষ্টি পড়ছে দেখছ না!'

রবিনা ম্যাডাম জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। সেদিকে চোখ রেখেই বললেন, 'এমন কিছু বৃষ্টি পড়ছে না—।'

এ-কথা শেষ হতে-না-হতেই সম্পি দৌড়ল হলের দরজার দিকে।

পিছন থেকে কাকলি ম্যাডাম, অঙ্গনা, ইলিনা সবাই 'সম্পি! সম্পি!' বলে ডাকতে লাগল।

কিন্তু সেসব ডাক সম্পির কানে বোধহয় ঢুকল না। ও ততক্ষণে হলের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেছে।

রবিনা ম্যাডাম আর দেরি করলেন না। সম্পির পিছন-পিছন দৌড়লেন। আর ওঁর সঙ্গে-সঙ্গে ছুট লাগাল ইলিনা আর সজনী।

বাইরেটা অন্ধকার, জলে ভেজা। সামনে পিচের রাস্তা, তারপর ছোট্ট একটা পার্কের মতো। এই পার্কে পতাকা তোলার ফাংশান হয়।

পার্কের চারপাশের রেলিং বেশ খাটো। ওরা দেখল, শর্টকাট করার জন্য সম্পি লাফিয়ে পার্কের রেলিং ডিঙিয়ে ওপারে পৌঁছে গেছে। ইলিনা আর রবিনা ম্যাডামরা পার্কটাকে পাশ কাটিয়ে সম্পিকে ধরার জন্য দৌড়ল।

পার্ক পেরিয়ে একটা সবুজ মাঠ। তারপর বাস্কেটবল গ্রাউন্ড। সম্পি সেখানে পৌঁছে কয়েক লহমা দাঁড়াল। তারপর রেলিং ঘিরে দৌড়তে যাবে তখনই রবিনা ম্যাডাম ওকে ধরে ফেলল। একটু পরেই ইলিনা আর সজনী সেখানে পৌঁছে গেল।

বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের রেলিং উঁচু, তাই সেটা ডিঙোনোর প্রশ্ন ওঠে না। সেইজন্যই সম্পি বোধহয় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ভাবছিল এরপর কী করবে। তা ছাড়া ঘোড়ার খুরের আওয়াজটা এখন আর শোনা যাচ্ছিল না।

কিন্তু সাদা আলোর বিন্দুগুলো আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

স্কুল-ক্যাম্পাসের নানা জায়গায় পিচের রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে।

রাস্তার একপাশে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাইটপোস্ট। তার ঝিমিয়ে পড়া আলো অন্ধকারের সঙ্গে অসম লড়াই করছে।

ওরা সবাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভিজছিল আর হাঁপাচ্ছিল। তাকিয়ে ছিল খাঁ-খাঁ বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের দিকে। রাস্তার আলো সেখানে ছিটকে এসে পড়েছে। কংক্রিটে বাঁধানো গ্রাউন্ড বৃষ্টির জল পড়ে চকচক করছে।

রবিনা ম্যাডাম বললেন, 'এবার ফিরে চল। ওই ঘোড়ার খুরের শব্দ...ওটা হয়তো ভুল শুনেছি। তা ছাড়া ওটা শুধু শব্দ...ভয়ের কিছু নেই। তোদের কাকলি ম্যাডাম একটুতেই ভয়-টয় পায়। চল....।'

রবিনা ম্যাডামের কথার পিঠে সমর্পিতা বলল, 'সে না হয় বুঝলাম, ম্যাডাম। কিন্তু ওই আলোগুলো কীসের? এখন দেখছেন, ওগুলো কেমন এদিক থেকে ওদিকে লাফাচ্ছে।'

সত্যিই তাই। আলোগুলো এখন লাফিয়ে উঁচু থেকে নীচে নামছে, আবার নীচ থেকে লাফিয়ে ওপরে উঠছে। কখনও ওগুলো আবার দপ করে নিভে যাচ্ছে।

রবিনা ম্যাডাম একটু ইতস্তত করলেন। বোধহয় ভাবলেন, ছাত্রীর কাছে সাহসের পরীক্ষায় তিনি হেরে যেতে চান না। তাই বললেন, 'চল তা হলে, একবার কাছ থেকে দেখে আসি....।'

বাস্কেটবল গ্রাউন্ডকে পাশ কাটিয়ে ওরা এগিয়ে গেল। সামনে বড়-বড় গাছপালা, আর তার পরেই বিশাল খেলার মাঠ। এই মাঠে খেলাধুলো ছাড়াও স্কুলের অ্যানুয়াল স্পোর্টস হয়। সেই মাঠটার একপাশে প্রায় তিনতলা সমান উঁচু একটা প্রকাণ্ড গাছ আছে। ওই গাছটা দেখলেই ইলিনার ভয় করে। কারণ, অত বড় গাছটায় একটিও পাতা নেই। শুধু অসংখ্য শুকনো ডালপালা কঙ্কালের মতো আকাশের দিকে ছড়িয়ে গেছে। হঠাৎ করে মনে হয়, কেউ যেন একশো হাতের পাঁচশো আঙুল আকাশের দিকে তুলে ভগবানের কাছে মুক্তি চাইছে।

বাস্কেটবল গ্রাউন্ড পেরিয়ে গাছপালার গাঢ় অন্ধকার এলাকায় ঢুকে পড়ল ওরা। ইলিনার এবার বেশ ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল, রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ওরা কোনও অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছে।

গাছপালার পাতায় বৃষ্টি আটকালেও পাতা থেকে টপটপ করে জল ঝরে পড়ছিল। সজনী ইলিনার হাত চেপে ধরেছিল। মনে হচ্ছিল, এইভাবে



'দেখি, তোমার খাতাটা দেখি—।'

ওদের শরীরে আর মনে ভরসার আদানপ্রদান হচ্ছিল।

সমর্পিতা রবিনা ম্যাডামকে বলল, 'ওই দেখুন ম্যাডাম, আলোগুলো আরও কতটা দূরে...।'

'মনে হয়, ওই মরা গাছটার কাছে...।' রবিনা ম্যাডাম বললেন।

ওরা জলের ওপরে পায়ের ছপছপ শব্দ তুলে এগোতে লাগল।

আরও অনেকটা এগোতেই ওরা দৃশ্যটা ঠিকঠাক দেখতে পেল। কারণ, সেই মুহূর্তেই আকাশে নীল বিদ্যুৎ ঝলসে উঠেছে, আর বাজ পড়ার শব্দ কানে আসার আগেই ওরা শুনতে পেল খিলখিল হাসির শব্দ।

মরা গাছটা ইলিনাদের কাছ থেকে এখন অন্তত তিরিশ-চল্লিশ মিটার দূরে। কিন্তু তার জন্য দেখতে কোনও অসুবিধে হল না।

তিনটে প্রাণী ওই মরা গাছটার ডালে নানান উচ্চতায় উবু হয়ে বসে আছে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় ছাতা। আর ছাতার নীচের অন্ধকারে দুটো করে সাদা আলোর চোখ জ্বলছে।

ওরা খিলখিল করে হাসছে আর বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো এ-ডাল থেকে সে-ডালে লাফাচ্ছে। কখনও লাফিয়ে ভিজে মাঠে নেমে আসছে, কখনও-বা মাঠ থেকে সোঁ করে লাফিয়ে উঠে যাচ্ছে ডালে। ওদের হাতে ধরা ছাতাগুলো অনেকটা প্যারাশুটের মতো লাগছে।

সজনী ভয়ে চাপা চিৎকার করে উঠতেই ইলিনা চট করে ওর মুখে হাত চাপা দিল।

রবিনা ম্যাডাম মরা গাছটার দিকে চোখ রেখেই ভয়ের গলায় জিগ্যেস করলেন, 'ওগুলো কী—মানুষ, না পশু?'

প্রশ্নটা কাকে লক্ষ্য করে সেটা বোঝা যায়নি বটে কিন্তু সমর্পিতা উত্তর দিল, 'ওগুলো মানুষ নয়, ম্যাডাম। মনে হচ্ছে, খারাপ কিছু....।'

সেই 'খারাপ কিছু'-টা যে কী সেটা ওরা চারজন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করল।

এমন সময় আবার বিদ্যুৎ চমকে উঠল। ওদের হাসির শব্দ স্পষ্ট শোনা গেল। তারপরই বাজ পড়ার বিকট শব্দে সেটা কিছুক্ষণের জন্য চাপা পড়ে গেল।

ইলিনারা অন্ধকারে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে সেই অলৌকিক সার্কাস দেখতে লাগল।

সজনী কাঁপা গলায় বলল, 'ম্যাডাম, ফিরে চলুন। আমার....আমার ভয় করছে...।'

'ফিরে যাব কেন?' বকুনির সুরে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন রবিনা ম্যাডাম। আঁচলে জড়ানো হাতের মুঠোয় ধরা টর্চটা বের করে মাটির দিকে তাক করে জ্বেলে ধরলেন। টর্চের জোরালো সাদা আলোয় বৃষ্টি-ভেজা ঘাস আর পাতা চোখে পড়ল। রবিনা বললেন, 'আমরা চারজন আছি—ভয় কীসের! আমরা সবাই মিলে তাড়া করলে ওরা....মানে, ওই অ্যানিম্যালগুলো পালাবে।'

রবিনার কথা শেষ হওয়ামাত্রই একটা চমকে ওঠা ঘটনা ঘটে গেল। সমর্পিতার ভেতরে কেউ যেন আচমকা সাহস এবং অ্যাকশনের সুইচ অন করে দিল। মেয়েটা 'অ্যাই, তোরা কে রে?' বলে কান-ফাটানো চিৎকার করে ভেজা মাঠের ওপর দিয়ে মরা গাছটা লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল। আর একইসঙ্গে 'চোর! চোর!' বলে চেঁচাতে লাগল।

রবিনা ম্যাডাম 'সম্পি! সম্পি!' বলে চিৎকার করে উঠলেন। তারপর টর্চ জ্বেলে সেটাকে সামনে পিস্তলের মতো বাগিয়ে ধরে সম্পির পিছন-পিছন ছুটতে শুরু করলেন। অবাক হয়ে ভাবলেন, মেয়েটা চেহারায় দশাসই হলেও বেশ জোরে ছুটতে পারে দেখছি!

রবিনা 'চোর! চোর!' বলে চিৎকার করছিলেন আর ইলিনাদের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিলেন।

ইলিনা আর সজনী ভয় পেয়ে গেল। কারণ, ওদের দুই সাহসী সদস্য এখন আর ওদের পাশে নেই। তাই ওরাও রবিনা ম্যাডামকে লক্ষ্য করে দৌড়তে শুরু করল। আর একইসঙ্গে 'চোর! চোর!' বলে চিৎকার করতে লাগল।

ওদের চারজনের চিৎকারে সার্ভেন্ট্স কোয়ার্টার থেকে লোকজন বেরিয়ে এল। কিন্তু অন্ধকার আর বৃষ্টির জন্য ওরা ভালো করে কিছু ঠাহর করতে পারছিল না।

সম্পিদের 'চোর! চোর!' চিৎকারে প্রাণীগুলো কিন্তু মোটেই ভয় পায়নি। বরং ওদের হাসাহাসি আর লাফালাফির খেলা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সম্পি খুব কাছাকাছি এসে পড়তেই ওরা লাফিয়ে মাটিতে নামল। তারপর হাসি বন্ধ করে মাথার ওপরে ছাতা ধরে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

রবিনা ম্যাডাম সম্পিকে প্রায় ধরে ফেলেছিলেন। শাড়ি পরে থাকলেও ওঁর অ্যাথলেটিক শরীর ওঁকে দ্রুত দৌড়তে সাহায্য করছিল।

ঘোলাটে অন্ধকারে রবিনা প্রাণীগুলোকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলেন না।

সম্পি রবিনার তুলনায় খানিকটা এগিয়ে ছিল। কিন্তু ও-ও ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু গাঢ় কালচে তিনটে ছাতার নড়াচড়া বুঝতে পারছিল।

যদি ওরা প্রাণীগুলোকে ঠিকমতো দেখতে পেত তাহলে আর এগোত না।

এমন সময় আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। পরপর দুবার।

সম্পিরা দেখতে পেল ওদের। সঙ্গে-সঙ্গে ডাকাবুকো সম্পি আর রবিনা ম্যাডাম থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওঁদের চিৎকার থেমে গেল।

ছাতার নীচে তিনটে ফ্যাকাশে সাদা বিকৃত মুখ। চোখগুলো পুরোটা কালো—তাতে সাদা অংশ বলে কিছু নেই। শুধু মাঝখানে দুটো উজ্জ্বল আলোর বিন্দু ধকধক করে জ্বলছে। ওদের ঠোঁট জোড়া টুকটুকে লাল—যেন লিপস্টিকে রাঙানো। তিনজনেরই ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে আছে। আর সেই ফাঁক দিয়ে ওদের দাঁত দেখা যাচ্ছে। এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসানো ঝকঝকে ইস্পাতের দাঁত। দাঁতগুলো মাপে ছোট, কিন্তু অসংখ্য।

এরা কারা? কোথা থেকে এল এখানে?

বিদ্যুতের আলো নিভে গেল। চারপাশ আবার ছায়া-অন্ধকার।

রবিনা ম্যাডামের হাত থরথর করে কাঁপছিল। সেই কাঁপা হাতে তিনি টর্চের আলো ছুড়ে দিলেন একজনের মুখে। তারপর আর-একজনের। তারপর...।

আবার দেখা গেল সেই ভয়ঙ্কর মুখ। আরও ভয়ঙ্কর ওদের পোশাক।

একজনের পরনে রঙিন শাড়ি। আর অন্য দুজনের গায়ে স্কুল-ড্রেস। সবুজ স্কার্ট আর সাদা টপ। মাথায় জোড়া বিনুনি করে ফিতে বাঁধা।

টর্চের আলোয় সাদা টপে রক্তের দাগ চোখে পড়ল যেন।

সঙ্গে সঙ্গে সম্পি ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

রবিনা ম্যাডামের গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। ওঁর হাতে ধরা টর্চের আলোটা ভীষণ কাঁপছিল। তখনই বিদ্যুৎ চমকে উঠল

আবার। তারপর কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল। বৃষ্টি আরও জোরে শুরু হল।

তিনটে মানুষ—কিংবা অমানুষ— আচমকা শূন্যে লাফ দিল। হাউইবাজির মতো ছিটকে চলে গেল দূরে।

তারপর আবার লাফ। আরও দূরে।

শেষে মিশে গেল অন্ধকারে।

এরকম লাফ মানুষ দিতে পারে না।

একটা অদ্ভুত 'গোঁ-গোঁ' শব্দ করে রবিনা ম্যাডাম অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। ওঁর হাতের টর্চ ছিটকে পড়ল দূরে।

সম্পি ওঁর শরীরের ওপরে ঝুঁকে পড়ে 'ম্যাডাম! ম্যাডাম!' বলে ডাকতে লাগল। পিছনে তাকিয়ে দেখল অনেকে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ফেস্টিভ্যাল হলের আলো আর সার্ভেন্ট্‌স কোয়ার্টারের আলোর পটভূমিতে মানুষগুলোর ছায়া দেখা যাচ্ছে।

|| চার ||

পরদিন স্কুলে হইচই যেটা হল সেটার ধরনটা অনেকটা ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো।

মেয়েদের মধ্যে চাপা ফিসফাস, তর্কবিতর্ক চলতে লাগল। আর সমর্পিতাকে ঘিরে যত উত্তেজনা, যত আলোড়ন। ও যেন সাহসের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছে। ওকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি ভিড়। তারপর হালকাভাবে ঘেরাও হয়েছে ইলিনা, সজনী, আর রিহার্সালে হাজির থাকা বাকি মেয়েরা।

ক্লাসের ফাঁকে-ফাঁকে কিংবা ক্লাসের মধ্যেই সম্পিকে একই কাহিনি বারবার বলতে হচ্ছে। অন্য মেয়েরা এক-একটা ক্লাসের পর পালা করে বসার জায়গা পালটে সম্পির পাশে গিয়ে বসছে। এইভাবে গতকাল রাতের ভয়ঙ্কর কাহিনি ছড়িয়ে গেল প্রায় সব ক্লাসেই।

স্কুলের হেডমিসট্রেস মিসেস প্রীতি দত্ত বেশ রাশভারী মানুষ। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে সরু মেটাল ফ্রেমের চশমা। ওঁকে খুব কম সময়েই হাসতে দেখা যায়।

তিনি সকাল থেকে প্রতিটি ক্লাসে ভিজিট করে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেছেন, যাতে এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি গুজব না ছড়ায়।

ইলিনাদের ক্লাসে হেডমিসট্রেস এলেন। তখন কাকলি ম্যাডামের বাংলা ক্লাস চলছিল। ছাত্রীদের লক্ষ্য করে বড়দি বললেন, 'শোনো, মেয়েরা। কাল রাতে যা হয়েছে সেটা আমার কানে এসেছে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, সিম্প্‌লি একটা....মানে....অ্যাক্সিডেন্ট। একে তো রাত, তার ওপরে মেঘ-বৃষ্টি। বুঝতেই পারছ ব্যাপারটা হ্যালুসিনেশান....মানে, দেখার ভুল হতে পারে। তা ছাড়া রবিনার তো শরীর ভালো নয়—লো প্রেশারে ভোগে। তাই ও হঠাৎ করে সেন্সলেস হয়ে গেছে....।

'যাই হোক, ব্যাপারটা নিয়ে তোমরা কারও সঙ্গে আর আলোচনা কোরো না। বরং বেস্ট হবে, যদি তোমরা সবাই এই ইন্‌সিডেন্টটা ভুলে যাও। তা না হলে কথার পিঠে কথা ছড়াবে....তারপর কোন সময় দেখবে পুলিশ আর টিভি চ্যানেলের লোকজন স্কুলে এসে হাজির হবে, আর হাজারটা কোয়েশ্চেন করে আমাদের সবাইকে জ্বালিয়ে খাবে। তা ছাড়া আমাদের স্কুলের একটা নামডাক আছে। সম্মান আছে।

'তা হলে মনে থাকবে তো? ব্যাপারটা আর কিছুই নয়...রাতবিরেতে দেখার ভুল। বুঝলে?'

ক্লাসের সব মেয়ে একসঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলল, 'মনে থাকবে, বড়দি।'

কাকলি ম্যাডামও কাঁচুমাচু মুখে ঘাড় কাত করলেন।

হঠাৎই সমর্পিতা উঠে দাঁড়াল ঃ 'বড়দি—।'

প্রীতি দত্ত ভুরু কুঁচকে বড়সড় চেহারার ছাত্রীটির দিকে তাকালেন।

ইলিনা আর সজনীর বুক দুরদুর করে উঠল। ওরা আঁচ করতে পারল সম্পি কী বলতে চলেছে। এই বোধহয় ও বড়দির বকুনি খেল!

'বড়দি, আমি কাল রাতে রবিনা ম্যাডামের সঙ্গে ছিলাম।'

'হ্যাঁ। জানি। তো?' ভুরুজোড়া আরও কাছাকাছি চলে এল।

'রবিনা ম্যাডাম....অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। আমি হইনি। আমি...সবটা নিজের চোখে দেখেছি—।'

'হ্যাঁ, শুনেছি। রবিনা বলেছে। কিন্তু এখন আর কোনও কথা শুনতে চাই না। তুমি, ইলিনা আর সজনী বরং টিফিনের সময় আমার রুমে এসো—তখন সব শুনব, আর আমার যা বলার বলব।' চোখের চশমাটা ঠিকঠাক করে নাকের ওপরে বসালেন প্রীতি দত্ত ঃ 'মোট কথা, এ-ব্যাপারে যেন একটা শব্দও বাইরে না যায়। আমাদের স্কুলের সুনামই হচ্ছে প্রথম এবং শেষ কথা। বুঝেছ?' শেষ শব্দটায় ধমকের সুর আরও স্পষ্ট শোনাল।

সমর্পিতা বেশ দমে গেল। ওর মুখ দেখে সেটা বোঝা গেল। আর কোনও কথা না বলে ও গুম হয়ে বসে পড়ল। কিন্তু ওর ভেতরে-ভেতরে একটা রাগ তৈরি হল। সবকিছু ও নিজের চোখে দেখেছে। তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা ওকে 'দেখার ভুল' বলে মানতে হবে!

এটা ঠিকই যে, আকাশে মেঘ ছিল, বৃষ্টি ছিল, অন্ধকার ছিল। কিন্তু বিদ্যুতের আলোও তো ছিল! তার সঙ্গে টর্চের আলো। তা ছাড়া ওদের চোখগুলো জ্বলছিল!

বড়দি ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সজনী আর ইলিনা ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে সম্পির দু-পাশে এসে বসে পড়ল। তারপর চাপা গলায় ফুসুর-ফুসুর শুরু করল। টিফিনের সময় বড়দির মুখোমুখি হওয়ার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। কাকলি ম্যাডামের ক্লাসের দিকে ওদের আর মন রইল না।

সম্পি চাপা গলায় ইলিনাকে বলল, 'আমি স্পষ্ট দেখেছি, দুজনের গায়ে আমাদের মতো স্কুল-ড্রেস ছিল। আর-একজনের ছিল শাড়ি।'

সম্পিদের কাছ থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও স্কুল-ড্রেস-এর ব্যাপারটা ইলিনা আর সজনীরও নজরে পড়েছিল। তাই 'হুঁ' বলে ওরা দুজনে ঘাড় নাড়ল।

সম্পি বলল, 'তার মানে, দুজন আমাদের স্কুলেরই স্টুডেন্ট্—নাইন অথবা টেন-এর....।'

ও এ-কথা বলার কারণ, সিনিয়ার স্কুলের ক্লাস নাইন আর টেন-এর স্টুডেন্ট্দের ড্রেস সাদা টপ আর সবুজ স্কার্ট। ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত স্কুল-ড্রেসটা অন্যরকম—সাদা ফ্রক, সবুজ টিউনিক। আর জুনিয়ার স্কুলের বিল্ডিংও আলাদা, ড্রেসও আলাদা ঃ সবুজ পাড় আর পাইপিং লাগানো সাদা ফ্রক।

সম্পি আবার বলল, 'আর শাড়িটা দেখেছিলি? ওটার রং ঠিকঠাক বুঝতে পারিনি, তবে পাড়ের চওড়া ডিজাইনটা আমার মনে আছে...।'

'তাতে কী হয়েছে?' ইলিনা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সম্পি ফিসফিস করে বলল, 'কাল ওই ডিজাইনের শাড়ি পরে আমাদের একজন ম্যাডাম স্কুলে এসেছিল.....।'

ইলিনা আর সজনীর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। কাল ওদের একজন ম্যাডাম সেই একই ডিজাইনের শাড়ি পরে স্কুলে এসেছিলেন? তারপর সেই ম্যাডাম অন্ধকার আর বৃষ্টির মধ্যে খেলার মাঠের ওই মরা গাছটার ডাল থেকে ডালে ছাতা মাথায় লাফিয়ে

বেড়াচ্ছিলেন? এ কী সর্বনেশে ব্যাপার!

'তুই জানিস কে সেই ম্যাডাম?' উত্তেজনায় কেঁপে যাওয়া গলায় জানতে চাইল সজনী।

'হ্যাঁ, জানি।' দুষ্টুমির চোখে একে-একে ইলিনা আর সজনীকে দেখল সম্পি। তারপর : 'কিন্তু নামটা তোদের এখন বলব না। আমি চুপচাপ থেকে ক'টা দিন ওই ম্যাডামের ওপরে নজর রেখে দেখি। তারপর....।'

ইলিনা সম্পির দিকে তাকাল।

সম্পির ফোলা-ফোলা গাল, অথচ তা সত্ত্বেও চোয়ালের শক্ত রেখা বেশ স্পষ্ট। ক্লাসরুমের পাখা বনবন করে ঘুরছে, কিন্তু সম্পির গালে, কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম।

দেখে মনে হচ্ছিল, সম্পি ব্যাপারটা নিয়ে রীতিমতো ছানবিন করবে বলে শপথ নিয়েছে।

ইলিনার ভয়-ভয় করে উঠল। কারণ, কাল রাতের তিনটে প্রেতিনীর মড়ার মতো মুখ ও অস্পষ্টভাবে হলেও দেখতে পেয়েছে। তা ছাড়া ওই খিলখিল হাসি!

ইলিনা আমতা-আমতা করে জিগ্যেস করল, 'বড়দির কাছে গিয়ে কী বলবি?'

'এসব কিচ্ছু বলব না। বলব আমি যা দেখেছি....।'

কথাটা সম্পি আর শেষ করল না। কারণ, ঠিক তখনই বাংলার ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ল।

টিফিনের স্বতঃস্ফূর্ত হইচই আজ বেশ কম মনে হল। কারণ, গতকালের অদ্ভুত খবরটা ফিসফিসে প্রচারে অনেকটাই ছড়িয়ে গেছে।

অনুষ্কার ডেস্কের দিকে চোখ গেল ইলিনার। ও আজ আসেনি। সকাল থেকেই ইলিনার চোখ বারবার অনুষ্কার ডেস্কের দিকে চলে যাচ্ছে। কেন কে জানে!

ইলিনা, সজনী আর সমর্পিতা তাড়াহুড়ো করে টিফিন খাওয়া শেষ করল। বড়দির ঘরে ডাক পড়েছে বলে তিনজনের বুক দুরদুর করছিল। ইলিনা ক্লাসরুমের বড় জানলা দিয়ে বাইরে একবার তাকাল। আকাশ মেঘলা। তার সঙ্গে সকাল থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি।

বড়দির কাছে গিয়ে কী বলবে সেটা সম্পি, ইলিনা আর সজনী বেশ কয়েকবার চাপা গলায় রিহার্সাল দিল। সম্পি বারবার বলছিল, 'আমি যা দেখেছি সেটাই স্ট্রেটকাট বড়দিকে বলব। যা সত্যি, তাই। লুকোনোর কী আছে?'

ইলিনা আর সজনী ওকে বোঝাতে লাগল।

এ নিয়ে অনেক সময় কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত ওরা তিনজনে প্রায় হাতে হাত ধরে বড়দির ঘরের দিকে রওনা হল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল।

একতলায় প্রীতি দত্তর বিশাল ঘর। ঘরের দু-পাশে দুটো করে জানলা। তাদের মাপ এত বড় যে, সাধারণ বাড়ির দরজাকেও হার মানায়। ডান-দিকের খোলা জানলা দিয়ে স্কুলের লাগোয়া ফুলের বাগান দেখা যাচ্ছে। বাগান পেরোলেই চোখে পড়ছে খাটো পাঁচিল ঘেরা এলাকা—তার ভেতরে ছোট-ছোট সার্ভেন্ট্স কোয়ার্টার।

সময়ের আঁচড়ে ময়লা হয়ে যাওয়া একটা প্রকাণ্ড মাপের সেক্রেটারিয়াট টেবিল। তার পিছনে বড়দি মুখ ভার করে বসে আছেন। টেবিলের ওপরে পেন স্ট্যান্ড, রাইটিং প্যাড, একটা মোবাইল ফোন, আর রাজ্যের খাতাপত্র ছড়ানো। টেবিলের একপাশে একটা পুরোনো মডেলের কম্পিউটার। আর বড়দির সামনে একটা গোলাপি রঙের কোঁচকানো রুমাল, তার পাশে একটা প্লাস্টিকের চাকতি দিয়ে ঢাকা দেওয়া কাচের গ্লাসে আধগ্লাস জল।

বড়দির মুখোমুখি চারটে হাতল-ওয়ালা কাঠের চেয়ার। চারটেই খালি। চেয়ারের পিঠ ধরে ইলিনারা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে বড়দির কথার অপেক্ষা করতে লাগল।

মাথার ওপরে কাঠের ব্লেডওয়ালা ঢাউস সিলিং ফ্যান 'ক্যাঁচক্যাঁচ' শব্দে ঘুরছিল। সেই বাতাসের ঝাপটায় ট্যালকাম পাউডারের হালকা গন্ধ ওদের নাকে আসছিল। আর বড়দির গলায় পাউডারের ছোপ চোখে পড়ছিল।

প্রীতি দত্ত ঠান্ডা চোখে সম্পির দিকে তাকালেন। অন্তত দশ সেকেন্ড স্থিরভাবে চেয়ে রইলেন—যেন ওকে হিপনোটাইজ করার চেষ্টা করছেন।

তারপর অতিরিক্ত মোলায়েম স্বরে বললেন, 'সমর্পিতা....তাই তো নাম তোমার?'

সম্পি চুপচাপ মাথা নাড়ল। যার মানে, হ্যাঁ।

'...এবার বলো তো, কাল রাতে তুমি ঠিক কী দেখেছ?'

ইলিনা বড়দির শাড়িটা লক্ষ করছিল। আজ বড়দি একটা টাঙ্গাইল শাড়ি পরে এসেছেন। চওড়া পাড়ে গাঢ় সবুজ রঙের নকশা তোলা। হালকা সবুজ জমির ওপরে গাঢ় সবুজের কলকা বোনা।

'মনে হয়....মনে হয়....' মেঝের দিকে তাকিয়ে আঙুল খুঁটতে লাগল সম্পি। বারকয়েক হোঁচট খেয়ে বলল, 'মনে হয়....মনে হয় আমি....ভুল দেখেছি, বড়দি। ওই অন্ধকার, মেঘ, তার ওপরে বৃষ্টি....।'

ইলিনা আর সজনী অবাক চোখে সমর্পিতার দিকে তাকাল।

এসব কী বলছে সম্পি? একটু আগেই না বলছিল, একজনের শাড়ির পাড়ের ডিজাইনটা ও লক্ষ করেছে! গতকাল একজন ম্যাডাম ওইরকম শাড়ি পরে স্কুলে এসেছিলেন। সেই ম্যাডামের ওপরে ও নজর রাখছে। এবং যা সত্যি তাই বলবে বড়দিকে।

তা হলে?

ইলিনা আর সজনীকে আরও অবাক করে দিয়ে সম্পি বড়দিকে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, বড়দি। কাল রাতে আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল। মানে, ব্যাপারটা মনে হয় আমার দেখার ভুল। মানে....ওই যে আপনি বললেন না.....হ্যালু....।'

'হ্যালুসিনেশান।' একগাল হেসে ওকে কথাটা ধরিয়ে দিলেন প্রীতি দত্ত, 'এই তো ভালো মেয়ের মতো কথা। গুড গার্ল।' এবার তিনি ইলিনা আর সজনীর দিকে তাকালেন ঃ 'তোমরা কিছু বলবে?'

অবাক ভাবটা কাটিয়ে ইলিনা আর সজনী একইসঙ্গে মাথা নাড়ল ঃ 'না, বড়দি, আমরা কিছুই দেখতে পাইনি—।' ওরা তখনও আড়চোখে বারবার সম্পিকে দেখছিল।

'গুড।' খুশির গলায় বললেন প্রীতি। তারপর স্নেহমাখা মোলায়েম গলায় আরও বললেন, 'তোমরা এখন বড় হয়েছ। স্কুলের ভালোমন্দ অনেকটাই বুঝবে। জানো, সুনাম তৈরি করতে বহু বছর লেগে যায়!

বড়দির কাছে গিয়ে কী বলবে সেটা সম্পি, ইলিনা আর সজনী বেশ কয়েকবার চাপা গলায় রিহার্সাল দিল। সম্পি বারবার বলছিল, 'আমি যা দেখেছি সেটাই স্ট্রেটকাট বড়দিকে বলব। যা সত্যি, তাই। লুকোনোর কী আছে?'

ইলিনা আর সজনী ওকে বোঝাতে লাগল।

এ নিয়ে অনেক সময় কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত ওরা তিনজনে প্রায় হাতে হাত ধরে বড়দির ঘরের দিকে রওনা হল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল।

একতলায় প্রীতি দত্তর বিশাল ঘর। ঘরের দু-পাশে দুটো করে জানলা। তাদের মাপ এত বড় যে, সাধারণ বাড়ির দরজাকেও হার মানায়। ডান-দিকের খোলা জানলা দিয়ে স্কুলের লাগোয়া ফুলের বাগান দেখা যাচ্ছে। বাগান পেরোলেই চোখে পড়ছে খাটো পাঁচিল ঘেরা এলাকা—তার ভেতরে ছোট-ছোট সার্ভেন্ট্স কোয়ার্টার।

সময়ের আঁচড়ে ময়লা হয়ে যাওয়া একটা প্রকাণ্ড মাপের সেক্রেটারিয়াট টেবিল। তার পিছনে বড়দি মুখ ভার করে বসে আছেন। টেবিলের ওপরে পেন স্ট্যান্ড, রাইটিং প্যাড, একটা মোবাইল ফোন, আর রাজ্যের খাতাপত্র ছড়ানো। টেবিলের একপাশে একটা পুরোনো মডেলের কম্পিউটার। আর বড়দির সামনে একটা গোলাপি রঙের কোঁচকানো রুমাল, তার পাশে একটা প্লাস্টিকের চাকতি দিয়ে ঢাকা দেওয়া কাচের গ্লাসে আধগ্লাস জল।

বড়দির মুখোমুখি চারটে হাতল-ওয়ালা কাঠের চেয়ার। চারটেই খালি। চেয়ারের পিঠ ধরে ইলিনারা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে বড়দির কথার অপেক্ষা করতে লাগল।

মাথার ওপরে কাঠের ব্লেডওয়ালা ঢাউস সিলিং ফ্যান 'ক্যাঁচক্যাঁচ' শব্দে ঘুরছিল। সেই বাতাসের ঝাপটায় ট্যালকাম পাউডারের হালকা গন্ধ ওদের নাকে আসছিল। আর বড়দির গলায় পাউডারের ছোপ চোখে পড়ছিল।

প্রীতি দত্ত ঠান্ডা চোখে সম্পির দিকে তাকালেন। অন্তত দশ সেকেন্ড স্থিরভাবে চেয়ে রইলেন—যেন ওকে হিপনোটাইজ করার চেষ্টা করছেন।

তারপর অতিরিক্ত মোলায়েম স্বরে বললেন, 'সমর্পিতা....তাই তো নাম তোমার?'

সম্পি চুপচাপ মাথা নাড়ল। যার মানে, হ্যাঁ।

'...এবার বলো তো, কাল রাতে তুমি ঠিক কী দেখেছ?'

ইলিনা বড়দির শাড়িটা লক্ষ করছিল। আজ বড়দি একটা টাঙ্গাইল শাড়ি পরে এসেছেন। চওড়া পাড়ে গাঢ় সবুজ রঙের নকশা তোলা। হালকা সবুজ জমির ওপরে গাঢ় সবুজের কলকা বোনা।

'মনে হয়....মনে হয়....' মেঝের দিকে তাকিয়ে আঙুল খুঁটতে লাগল সম্পি। বারকয়েক হোঁচট খেয়ে বলল, 'মনে হয়....মনে হয় আমি....ভুল দেখেছি, বড়দি। ওই অন্ধকার, মেঘ, তার ওপরে বৃষ্টি....।'

ইলিনা আর সজনী অবাক চোখে সমর্পিতার দিকে তাকাল।

এসব কী বলছে সম্পি? একটু আগেই না বলছিল, একজনের শাড়ির পাড়ের ডিজাইনটা ও লক্ষ করেছে! গতকাল একজন ম্যাডাম ওইরকম শাড়ি পরে স্কুলে এসেছিলেন। সেই ম্যাডামের ওপরে ও নজর রাখছে। এবং যা সত্যি তাই বলবে বড়দিকে।

তা হলে?

ইলিনা আর সজনীকে আরও অবাক করে দিয়ে সম্পি বড়দিকে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, বড়দি। কাল রাতে আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল। মানে, ব্যাপারটা মনে হয় আমার দেখার ভুল। মানে....ওই যে আপনি বললেন না.....হ্যালু....।'

'হ্যালুসিনেশান।' একগাল হেসে ওকে কথাটা ধরিয়ে দিলেন প্রীতি দত্ত, 'এই তো ভালো মেয়ের মতো কথা। গুড গার্ল।' এবার তিনি ইলিনা আর সজনীর দিকে তাকালেন : 'তোমরা কিছু বলবে?'

অবাক ভাবটা কাটিয়ে ইলিনা আর সজনী একইসঙ্গে মাথা নাড়ল : 'না, বড়দি, আমরা কিছুই দেখতে পাইনি—।' ওরা তখনও আড়চোখে বারবার সম্পিকে দেখছিল।

'গুড।' খুশির গলায় বললেন প্রীতি। তারপর স্নেহমাখা মোলায়েম গলায় আরও বললেন, 'তোমরা এখন বড় হয়েছ। স্কুলের ভালোমন্দ অনেকটাই বুঝবে। জানো, সুনাম তৈরি করতে বহু বছর লেগে যায়!

কিন্তু দুর্নাম?' একটু থামলেন। তারপর : 'দুর্নাম হওয়ার জন্যে একটা দিনই যথেষ্ট। আসলে...।'

বড়দির বক্তব্যের স্রোতে বাধা পড়ল। কারণ, মলিনাদি ঘরে এসে ঢুকল।

মলিনাদি বড়দির খাসবেয়ারা। তা ছাড়া ক্লাসে-ক্লাসে নোটিস নিয়ে যায়।

মলিনাদি বেশ মোটাসোটা। রং কালো, মাথায় কাঁচাপাকা চুল। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা—তার একটা ডাঁটিতে তাপ্পি লাগানো।

ইলিনারা লক্ষ করল মলিনাদি বেশ হাঁপাচ্ছে, আর চোখগুলো গোল-গোল।

'কী হয়েছে, মলি?' কথা থামিয়ে প্রীতি দত্ত প্রশ্ন করলেন।

বড়-বড় শ্বাস টেনে-টেনে মলিনা বলল, 'বলাইদার ছেলে....বলাইদার ছেলে....পরান...পরান...।'

'কী হয়েছে পরানের? কী হয়েছে?' বড়দি প্রশ্ন করতে-করতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

'পরান...পরান মারা গেছে গো, দিদি, মারা গেছে!' এ-কথা বলেই মলিনা চাকরিজীবনে কখনও যা করেনি তাই করে বসল। বড়দির সামনেই ধপাস করে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল এবং বুকে দু-হাত চেপে উত্তেজনাটাকে সামাল দিতে চেষ্টা করল।

মলিনার অসংলগ্ন কথা থেকে প্রীতি দত্ত অনেক কষ্টে গোটা গল্পটা উদ্ধার করলেন।

স্কুলের ঘণ্টা বাজায় যে-বলাইদা, সে সার্ভেন্ট্স কোয়ার্টারে থাকে। তার বয়েস অনেক। মাথার মাঝখানে টাক। তার চারদিকে সাদা ঝালরের মতো চুল। মুখে খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি। খানিকটা কুঁজো হয়ে থাকা বৃদ্ধ শরীর। ধীরে-ধীরে হাঁটা-চলা করে। কিন্তু বলাইদার ঘণ্টা বাজানোর জোর অবাক করে দেওয়ার মতো।

সেই বলাইদার জোয়ান ছেলে পরান কাছাকাছি একটা রেশন-দোকানে চাকরি করে। অনেক সময় হিসেবনিকেশের চাপে পরান রাতে সেই দোকানেই থেকে যায়। কাল রাতেও সেরকম কিছু একটা হয়েছে বলে



'...আমার বাড়িতে যাচ্ছ, এ-কথাটা কাউকে এখন বোলো না...প্লিজ...'

বলাইদারা ভেবেছিল। কিন্তু আজ সকালে পরান না ফেরায় বলাইদারা অপেক্ষা করে-করে শেষ পর্যন্ত বেলায় পরানের খোঁজ করতে সেই দোকানে যায়। গিয়ে শোনে, গতকাল রাতে পরান বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ি রওনা হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য ও দোকান থেকে শুধু একটা পলিথিনের প্যাকেট নিয়েছিল।

তখন বলাইদারা পাগলের মতো পরানের খোঁজ করতে থাকে। হাসপাতালে, থানায়, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে—সব জায়গায়।

কিন্তু পরানকে পাওয়া যায়নি।

তারপর, একটু আগে, কোয়ার্টারের একটা বাচ্চা ছেলে স্কুলের পিছনদিকের পাঁচিলের কাছে 'ছোট বাইরে' করতে গিয়ে পরানের ডেডবডি দেখতে পায়।

চারটে বড়-বড় আমগাছ আর কৃষ্ণচূড়া গাছের মাঝে বৃষ্টির জলে ভেজা আগাছা আর ঘাস-পাতার ওপরে পরানের দেহটা পড়ে ছিল। ওর মাথাটা ছিল একটা পলিথিনের প্যাকেটে ঢাকা।

বাচ্চা ছেলেটা বুঝতে না পেরে 'পরানদা, পরানদা—' বলে পলিথিনের প্যাকেটটা ধরে টান মারে। জলে ভেজা প্যাকেটটা খুলে আসতেই পরানের ফ্যাকাশে মুখটা দেখা যায়।

পরানের গায়ের রং শ্যামলা হলেও দেখা গেল, ওর সারাটা শরীর সাদাটে, রক্তশূন্য। চোখ দুটো বড়-বড়, যেন ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসবে। আর ঘাড়ে-গলায় চার-পাঁচ জায়গায় গভীর ক্ষতের দাগ। সেখানে কালচে রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

এসব কথা শুনে প্রীতি দত্তের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর মলিনাদি বলল, সার্ভেন্ট্স কোয়ার্টারের কারা যেন বড়দির পারমিশান না নিয়ে এর মধ্যেই পুলিশে খবর দিয়ে দিয়েছে।

ইলিনা, সম্পি আর সজনী ভয়ে রীতিমতো কাঁপছিল। পরানের মৃতদেহের যে-সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মলিনাদি দিয়েছে তাতেই ওরা রক্তশূন্য ছাইরঙা ডেডবডিটা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল।

প্রীতি দত্ত টেবিল থেকে গ্লাস তুলে নিয়ে দু-ঢোক জল খেলেন। কয়েকটা বড়-বড় শ্বাস নেওয়ার পর কিছুটা সামলে উঠলেন। তারপর

তড়িঘড়ি সঙ্গিদের বিদায় দিলেন। আপনমনেই বললেন, 'কী- সর্বনাশ! মনে হচ্ছে, স্কুল ক'দিন ছুটি দিতে হবে...।'

মলিনা ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'আমি বডিটা স্বচক্ষে দেখে এলুম, দিদি। এ একেবারে অপঘাতে মিত্যু। নিঘ্‌ঘাৎ ডাকিনি-পিশাচের কাজ। সারা শরীলটায় রক্ত নেই। একেবারে সাদা। এবারে কী হবে, দিদি?'

মলিনার আর্ত আবেদন বড়দির কানে পৌঁছল কি না বোঝা গেল না। তিনি তখন টেবিল থেকে মোবাইল ফোন হাতে তুলে নিয়েছেন। কপালে ভাঁজ ফেলে চোখ সরু করে মলিনার উচ্চারণ করা মারাত্মক দুটো শব্দ নিয়ে ভাবছেন।

এই স্কুলে ডাকিনি আর পিশাচ এল কোথা থেকে?

॥ পাঁচ ॥

তিন দিন স্কুল ছুটি দেওয়া হল। তার সঙ্গে রবিবার জুড়ে গিয়ে চার দিন। সেই চারদিনে পুলিশি তদন্ত মোটামুটি একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল। কিন্তু পরানের দেহের রক্তশূন্যতার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। পুলিশের রিপোর্টে হায়েনা, গোসাপ কিংবা বড়সড় কোনও বেজির আক্রমণের সম্ভাবনার কথা বলা হল—যদিও পুলিশের লোকজনের কাছে প্রচুর প্রশ্নচিহ্ন থেকে গেল।

ব্যাপারটা নিয়ে জল ঘোলা যাতে কম হয় সেইজন্য প্রীতি দত্ত পুলিশের কাছে স্টেটমেন্টে শুধু রবিনা ম্যাডামের কথা বলেছেন। বলেছেন, সেই রাতে ওইসব আজগুবি কাণ্ডকারখানা রবিনা ম্যাডাম একা দেখেছেন—ছাত্রীরা কেউ দেখেনি। তাই ইলিনারা পুলিশের জেরা থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।

সোমবার স্কুলে গিয়ে স্কুলটাকে নতুন চোখে দেখতে চাইল ইলিনা।

আজ বৃষ্টি নেই। আকাশে মেঘের চেহারা অনেক ফিকে। কিন্তু সেই রাতের ঘটনাটা চোখের সামনে থেকে কিছুতেই সরে যাচ্ছে না।

কালো মেঘ। লিকলিকে শাখা-প্রশাখা ছড়ানো মরা গাছ। অন্ধকার রাত। আর সেই উজ্জ্বল আলোর চোখ।

ঘটনার পরদিন সকালে স্কুলের দিকে আসার সময় মরা গাছটার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ইলিনা। ওটার চারপাশে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নজর বুলিয়েছিল। কিন্তু গতকাল রাতের ওই ঘটনার কোনও চিহ্ন খুঁজে পায়নি। তা সত্ত্বেও ওর গা ছমছম করছিল।

তারপর, পরানের অপঘাতে মারা যাওয়ার খবরটা পাওয়ার পর, ওর মনে হয়েছে, ওই 'খারাপ' প্রাণিগুলো কখনও চিহ্ন রেখে যায় না।

আজ সকালেও স্কুলে আসার সময় দূর থেকে ওই মরা গাছটার

দিকে ইলিনা তাকিয়ে থেকেছে। আর তখনই এক অদ্ভুত শিরশিরানি টের পেয়েছে শরীরে।

আজ ক্লাসে ঢুকে অনুষ্কাকে দেখতে পেয়ে ওর খুব ভালো লাগল। সুন্দর টলটলে মুখটি নিয়ে চুপচাপ নিজের ডেস্কে বসে আছে। ওর মুখের ডানপাশে জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে। সেই আলোয় ওকে কেমন যেন স্বপ্নের মতো দেখাচ্ছে। নিজের চিন্তায় ডুবে থাকা এক রূপসী।

অনুষ্কার দুপাশে রেখা আর সঞ্চিতা বসে। দুজনের মধ্যে রেখার সঙ্গে ইলিনার রিলেশানটা বেটার। তাই ও রেখাকে বলে বসার জায়গা অদলবদল করল। পিঠের ব্যাগ হাতে নিয়ে অনুষ্কার পাশের ডেস্কে বসে পড়ল।

'অনেকদিন তোমাকে দেখিনি।' ইলিনা হেসে বলল।

'স্কুল তো ছুটি ছিল। তা ছাড়া সেই বাজে দিনটায় আমি তো আসিনি...তার পরের দিনও আসিনি।'

না এলেও অনুষ্কা ফোনে-ফোনে সব ঘটনাই জেনে গেছে। বড়দি যতই বারণ করে থাকুন, এই ভয়ংকর বিচিত্র ব্যাপারটা নিয়ে চাপা কথাচালাচালি মোটেই বন্ধ হয়নি।

ইলিনাও এই ছুটির মধ্যে অনুষ্কাকে ফোন করেছিল। ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলে ইলিনার মনে হয়েছিল অনুষ্কা যেন কিছু বলতে চায় কিন্তু বলতে পারছে না।

ক্লাস শুরু হতে এখনও সাতমিনিট বাকি। তাই গোটা ক্লাসে ভোমরার গুনগুন চলছিল। ইলিনা অনুষ্কার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'জানো, আমার না এখন স্কুলে আসতে ভয় করে...।'

'কেন?' অনুষ্কা ভুরু তুলে তাকাল।

'ওই রাতটার কথা বারবার মনে পড়ে...।'

অনুষ্কা একটা হাত রাখল ইলিনার হাতে। ওর ছোঁয়া ইলিনার ভালো লাগল। সেই ছোঁয়ায় কেমন যেন একটা ভরসা ছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর অনুষ্কা আলতো গলায় বলল, 'আজ ছুটির পর তুমি বরং আমার বাড়িতে চলো। বাপি গাড়ি নিয়ে আমাকে নিতে আসবে। তারপর বাড়িতে গিয়ে আমরা অনেক গল্প করব। সময়টা দারুণ কাটবে। তুমি—।'

'তোমার কোনও প্রবলেম হবে না তো!' ইলিনা কথাটা বলল বটে, কিন্তু ওর ভেতরে-ভেতরে খুব আনন্দ হচ্ছিল। সেই প্রথম দিন থেকেই ও অনুষ্কার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে, বন্ধুত্ব করতে চেয়েছে। আর আজ অনুষ্কা নিজে থেকেই ওকে ওর বাড়িতে যেতে বলছে! এই প্রথম।

'না, না, প্রবলেম কীসের!' অনুষ্কা তাড়াতাড়ি বলল, 'আমিই তো তোমাকে আসার জন্যে রিকোয়েস্ট করছি।'

'কিন্তু বাড়িতে ফোন করে একটু বলতে হবে—নইলে মা ভীষণ টেনশান করবে।'

স্কুলে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা শুধু নয়, সঙ্গে করে নিয়ে আসাটাই বারণ। এ নিয়ে গত বছরে একটা বড়সড় গোলমাল হয়েছিল। সুতরাং ইলিনার মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। ওদের কারও কাছে সেলফোন নেই। মা-কে ফোন করে খবরটা দেবে কেমন করে!

ওর মনের কথা অনুষ্কা বোধহয় টের পেল। বলল, 'তোমার কোনও চিন্তা নেই। বাপির সঙ্গে মোবাইল থাকে। ছুটির পর বাপির ফোন থেকে তুমি আন্টিকে ফোন করে দিয়ো। তার সঙ্গে বোলো, আন্টি যেন তোমার ফেরার চিন্তা না করেন। বাপি তোমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসবে—অবশ্য বাপির সঙ্গে আমিও থাকব।' হেসে কথাটা শেষ করল অনুষ্কা। কিন্তু তারপরই হঠাৎ চাপা গলায় বলল, 'আমার বাড়িতে যাচ্ছ এ-কথাটা কাউকে এখন বোলো না... প্লিজ...।'

'বলব না।' মাথা হেলিয়ে বলল ইলিনা। ভাবল, অনুষ্কাটা এত মুখচোরা কেন কে জানে! তা ছাড়া ওর বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারটা গোপন করারই বা কী আছে?

ইলিনার একটু অবাক লাগছিল। যে-অনুষ্কা সবার সঙ্গে আলাপ-টালাপ করার ব্যাপারটা সবসময় এড়িয়ে চলে সে হঠাৎ ইলিনাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করছে! এ-ক'দিনে ও হঠাৎ পালটে গেল কেন?

সে যাই হোক, ইলিনার মনটা খুশি-খুশি হয়ে উঠল। আর তখনই স্কুলের প্রথম ক্লাস শুরু হওয়ার ঘণ্টা পড়ল।

একটার পর একটা ক্লাস পেরিয়ে সময়টা ক্রমশ বিকেলের দিকে গড়াতে

লাগল, আর ইলিনার উৎফুল্লতা তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়তে লাগল।

টিফিনের সময় অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে ইলিনা বুঝল, এমনিতে সবাই চুপচাপ থাকলেও পরানের ব্যাপারটা নিয়ে ভালোরকম ফিসফাস কানাকানি হচ্ছে।

খবরটা কোনও নিউজ চ্যানেলে দেখায়নি কিংবা কাগজেও ছাপেনি। হয়তো প্রীতি দত্তের অনুরোধে কিংবা প্রভাবে পুলিশ মুখে কুলুপ এঁটেছে আর মিডিয়া হাত গুটিয়ে বসে থেকেছে। কিন্তু 'হুইসপারিং ক্যাম্পেন' বসে থাকেনি।

টিফিনের সময় ইলিনা একা-একাই টিফিন খেল। ওর শত অনুরোধেও অনুষ্কা ওর টিফিন শেয়ার করল না। বারবার সুন্দর করে হেসে বলল, 'আমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি। তা ছাড়া আমার চট করে খিদে পায় না।'

ইলিনার বেশ খটকা লাগলেও কিছু বলল না।

ছুটির সময় যতই এগিয়ে এল আকাশ ততই কালো হয়ে উঠল। মেঘও ডেকে উঠল দু-চারবার। অনুষ্কা অপছন্দের মুখে জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বর্ষাকালটা খুব বিচ্ছিরি। আমার ভাল্লাগে না।'

ইলিনা ওর দিকে তাকাল শুধু— কিছু বলল না।

সাড়ে চারটের সময় ছুটির ঘণ্টা পড়তেই ওরা সিঁড়ি নেমে চলে এল একতলায়। গাড়িবারান্দার বাইরে বেরিয়ে আকাশের দিকে একবার তাকাল। মেঘের যা চেহারা তাতে মনে হচ্ছে জলকণার ভারে মেঘের দল কাবু হয়ে পড়েছে। যে-কোনও মুহূর্তে মেঘের চাদর ফুঁড়ে জলের ধারা নীচে নামবে, পৃথিবী ভাসিয়ে দেবে।

অনুষ্কা ইলিনার হাত ধরে টান মারল : 'শিগগির চলো। বাপি গাড়িটাকে ওপাশটায় দাঁড় করায়—।'

পিচের রাস্তা ধরে ওরা দুজনে তাড়াতাড়ি পা চালাল। অন্য মেয়েরাও চটপট এগিয়ে চলেছে মেন গেটের দিকে। কেউ-কেউ আবার ছুটছে। নিউ কাটের খটখট শব্দে বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের ভূতুড়ে ঘোড়সওয়ারদের কথা মনে পড়ে গেল ইলিনার।

পিচের রাস্তার বাঁ-দিকটা বলতে গেলে জঙ্গলে ঢাকা। আগাছার জংলা ঝোপ, আর তার মাঝে-মাঝে কয়েকটা বড়-বড় গাছ। গাছের পাতার

আড়াল থেকে কোকিল ডাকছে। দুটো ফিঙে ঘূর্ণি নাচের ভঙ্গিতে উড়ছে। বোধহয় উড়ন্ত পোকামাকড় ধরছে। একটা কাঠবিড়ালি একটা বড় গাছের ডালে বসে ইলিনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তবে সামান্য ছুতোয় ছুটে পালানোর জন্য সে বেশ তৈরি বলেই মনে হল। মেঘলার জন্য ঘোলাটে ছায়া থাকলেও কাঠবিড়ালিটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

অনুষ্কা কাঠবিড়ালিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। ওর চোখে আকাঙ্ক্ষার আলতো ছোঁয়া দেখতে পেল ইলিনা। জিগ্যেস করল, 'কাঠবিড়ালি তুমি ভালোবাসো?'

অনুষ্কা চমকে ঘুরে তাকাল ঃ 'দারুণ ভালোবাসি।'

'তা হলে ধরে নিয়ে চলো—পুষবে।'

কথাটা ইলিনা খুব হালকাভাবেই বলেছিল। কিন্তু ওর কথা শেষ হতে না হতেই অনুষ্কা একটা আজব কাণ্ড করে বসল।

রাস্তা ছেড়ে পলকে ছুটে গেল জঙ্গলের দিকে। এবং কাঠবিড়ালিটাকে লক্ষ্য করে শূন্যে লাফ দিল।

কাঠবিড়ালিটা আর দেরি করেনি। অনুষ্কা তাকে তাক করে লাফানোমাত্রই সে গাছের ডাল বেয়ে সড়সড় করে আরও ভেতরদিকে ছুটে গেল।

কিন্তু অনুষ্কাও হাল ছাড়ার পাত্রী নয়। ও-ও তৎপর ভঙ্গিতে লাফের পর লাফ মেরে আগাছা আর গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল।

ইলিনা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পিঠে স্কুল-ব্যাগের বোঝা চাপানো অবস্থায় অনুষ্কা যে-স্পিডে কাঠবিড়ালিটাকে তাড়া করল তাতে ও অবাক হয়ে গিয়েছিল। মনে হল, অনুষ্কা যেন লং জাম্প আর ট্রিপল জাম্পে তুখোড় কোনও অ্যাথলিট।

অনুষ্কার ব্যাপারটা আরও দু-চারজন মেয়ের চোখে পড়েছিল। তারাও মজা দেখার লোভে ইলিনার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়েছে।

আগাছার ঝোপ আর গাছের পাতা নড়াচাড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু মেঘলা ছায়াতে অনুষ্কাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। তবে ওর সাদা টপের ঝলক দেখা যাচ্ছিল।

একটু পরেই অনুষ্কা গাছপালার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল। ওর স্কার্ট আর টপের এখানে-সেখানে গাছের পাতার টুকরো-টাকরা লেগে আছে। আর ডানহাতের মুঠোয় ধরা একটা কাঠবিড়ালি। চিঁ-চিঁ করে ডাকছে।



...কাঠবিড়ালিটাকে লক্ষ্য করে শূন্যে লাফ দিল...

ইলিনা তো অবাক। ছুটে গিয়ে কেউ কাঠবিড়ালি ধরেছে এমনটাও কখনও শোনেনি। আর অনুষ্কার ক্ষিপ্রতা কোনও শিকারি চিতাকেও হার মানাবে!

অবাক হল বাকি সব মেয়েরাও। ওরা অনুষ্কাকে ঘিরে কাঠবিড়ালি দেখতে লাগল।

অনুষ্কা বাঁ-হাতে স্কার্ট ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, 'কী কিউট, না? এটা আমি পুষব।'

ইলিনা বলল, 'বাব্বা, তোমার কী স্পিড! স্পোর্টসে নাম দিলে তুমি অনেক প্রাইজ পাবে।'

অনুষ্কা হাসল শুধু—কোনও কথা বলল না।

এমন সময় মেঘ ডাকল আবার। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে শুরু করল।

সঙ্গে-সঙ্গে অনুষ্কা যেন শক খেয়ে চমকে উঠল। 'শিগগির চলো—বৃষ্টি পড়ছে' বলে পিচের রাস্তা ধরে ছুট লাগাল।

অন্য মেয়েগুলো একটু অবাক হয়ে গেল। এ-বৃষ্টি ভেজার মতন কিছু নয়। তাই অনুষ্কার দৌড়টা ওদের বেখাপ্পা মনে হল। আর ইলিনার মনে পড়ে গেল প্রথম দিন আলাপের সময় অনুষ্কা বলেছিল, '....বৃষ্টি আমার ভাল্লাগে না....।'

ইলিনা একটুও দেরি না করে অনুষ্কার পিছন-পিছন দৌড়ল।

দূরে মরা গাছটা দেখা যাচ্ছে। সেই রাতের দৌড়টার কথা ওর মনে পড়ে গেল।

পিচের রাস্তা ধরে বাঁ-দিকে বাঁক নিতেই সার বেঁধে পার্ক করা কয়েকটা প্রাইভেট কার চোখে পড়ল। তার পাশে হলদে রঙের তিনটে স্কুল-বাস।

একটা সাদা গাড়ির সামনে বড় একটা ছাতা মাথায় দিয়ে সুপুরুষ একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভদ্রলোকের মাথায় কুচকুচে কালো কোঁকড়ানো চুল, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা, আর মুখে একগাল হাসি। ওঁকে দেখতে এত সুন্দর যে, স্রেফ দেখেই বোঝা যায় উনি অনুষ্কার বাবা।

ছুটন্ত অনুষ্কার দিকে ছাতা বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। আর একইসঙ্গে

গাড়ির সামনের প্যাসেঞ্জার সিটের দরজাটা খুলে ধরলেন। ইলিনা লক্ষ করল, গাড়ির জানলায় টিন্টেড গ্লাস লাগানো।

গাড়িতে উঠতে-উঠতে অনুষ্কা বলল, 'বাপি, ও ইলিনা—আমার ক্লাসমেট.....আমার খুব বন্ধু। ও আমাদের সঙ্গে এখন যাবে—।'

'তাই?' চওড়া করে হাসলেন অনুষ্কার বাপি ঃ 'গুড—ভেরি গুড। এসো, এসো—উঠে পড়ো গাড়িতে বৃষ্টিতে ভিজো না। পিছনের একটা দরজা খুলে ইলিনাকে গাড়িতে ওঠার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

ইলিনা গাড়িতে উঠে পিঠের স্কুল- ব্যাগটা খুলে সিটের ওপরে রাখতেই বাপি দরজাটা বন্ধ করে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসলেন। গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার সময় ছোট্ট কাঠবিড়ালিটা বাপিকে দেখাল অনুষ্কা।

'এই দ্যাখো, বাপি, এই কাঠবিড়ালিটা স্কুলের বাগান থেকে ধরেছি। এটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পুষব...।'

কাঠবিড়ালিটা তখন কিচকিচ করে শব্দ করছে, ওর কালো চোখের তারা চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক দেখছে।

কাঠবিড়ালিটার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বাপি। তারপর জোরে হেসে বললেন, 'ওটা আগেই আমি দেখেছি। বাঃ, গুড—ভেরি গুড। কিন্তু কত কিছুই তো তুমি পুষবে বলে ধরে আনো। তারপর কতটুকু কী পোষা হয় তা তুমি ভালোই জানো!' মেয়ের দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকিয়ে কী এক গোপন রসিকতায় হেসে উঠলেন। তারপর একপলক ইলিনাকে দেখে নিলেন।

কাঠবিড়ালিটার গায়ে একবার আদরের হাত বুলিয়ে গাড়ি চালাতে শুরু করলেন বাপি।

অনুষ্কা বলল, 'বাপি, তোমার ফোনটা দাও। ইলিনা ওর বাড়িতে একটা ফোন করবে—নইলে ওর মা-বাবা চিন্তা করবে....।'

'ওহ্ শিয়োর—এই নাও।' জামার বুকপকেট থেকে রুপোলি রঙের একটা ছোট্ট মোবাইল ফোন বের করে মেয়ের দিকে এগিয়ে দিলেন।

অনুষ্কা আর ইলিনা চটপট বোতাম টিপে ফোনের কাজটা সেরে নিল।

গাড়ির ভেতরে একটা অদ্ভুত পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছিল ইলিনা। মনে হচ্ছিল, মিহি দারচিনি গুঁড়ো কেউ বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছে।

এই গন্ধটা ও অনুষ্কার কাছে কখনও পায়নি। তা হলে কি ওর বাপি

এরকম অফবিট পারফিউম লাগিয়েছে? নাকি এটা স্পেশাল টাইপের কোনও কার পারফিউম?

অনুষ্কার বাপি গাড়ি চালাতে-চালাতে নানান বিষয়ে বকবক করছিলেন আর মাঝে মাঝেই হেসে উঠছিলেন। তবে ওঁর বেশি আগ্রহের বিষয় যে সিনেমা আর নাটক সেটা বোঝা যাচ্ছিল। গল্প করার ফাঁকে তিনি থেকে-থেকেই বলছিলেন, 'এই তো, এসে গেলাম....।'

গাড়ি নানান রাস্তা ধরে চলছিল। ইলিনা কোনও রাস্তাই চিনতে পারছিল না। অবশ্য ওর চেনার কথাও নয়। ওর শুধু মনে হচ্ছিল, অনুষ্কা ওর 'বেস্ট ফ্রেন্ড' হতে চলেছে। আর সেই চিন্তাটা ওর মনে খুশির বাতাস ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

একটু পরেই গাড়ি যে-বাড়িতে এসে ঢুকল সেটা মাপে ছোট হলেও অনায়াসে তাকে বাগানবাড়ি বলা যায়। কারণ, অবহেলায় ফেলে রাখা বাগানের একপাশে একটা ছোট দোতলা বাড়ি। বাড়ি আর বাগান জং ধরা রেলিঙে ঘেরা। তার কোথাও-কোথাও এমনভাবে ভাঙা যে, কুকুর-বেড়াল কি অন্যান্য ছোট প্রাণী সহজেই ঢুকে পড়তে পারে।

বাড়িটা পুরোনো ধাঁচের, তবে সদ্য রং করা হয়েছে। সেই রংটা গরিব পথশিশুর গায়ে ঝকঝকে নতুন জামা-প্যান্টের মতো দেখাচ্ছে।

বাড়ির ছাদের কার্নিশে অনেক গোলাপায়রা বসে আছে। মাঝে-মাঝে পায়রাগুলো এদিকে-ওদিকে উড়ে যাচ্ছে।

আকাশ মেঘে-মেঘে কালো। বৃষ্টি এখন নেই, কিন্তু যে-কোনও সময় শুরু হতে পারে।

গাড়ি বাড়ির কাছে গিয়ে থামল। ওরা তিনজনে নেমে বাড়িতে ঢুকল। অনুষ্কার হাতে ধরা কাঠবিড়ালিটা তখনও কিচকিচ করে শব্দ করছে।

বাড়িতে ঢোকার সময় অনুষ্কার বাপি ইলিনাকে বললেন, 'ওয়েলকাম, ইলিনা—ওয়েলকাম টু আওয়ার লিট্‌ল হাউস। যাও, অনুষ্কার সঙ্গে ওপরে যাও। ওর ঘরে বসে গল্প করো, টিভি দ্যাখো, চুটিয়ে আড্ডা মারো—এনজয় করো....।' একটু থেমে অনুষ্কার দিকে হাত বাড়িয়ে চাপা গলায় বললেন, 'দাও, ওটা আমাকে দাও। জায়গামতো রেখে দিই....।'

অনুষ্কা কোনও কথা না বলে কাঠবিড়ালিটা বাপির হাতে দিল। ওটার মাথায় ছোট্ট করে হাত বুলিয়ে বাপি বললেন, 'সুইট স্কুইরেল...।'

এই কথা বলে বাপি একতলার একটা ঘরে ঢুকে গেলেন। আর ওরা দুজনে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগল।

বাড়িটা নতুন রং করা হয়েছে বলে ইলিনা রঙের গন্ধ পাচ্ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে দারচিনির মিষ্টি গন্ধটাও ওর নাকে আসছিল।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় বাড়িটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিল ইলিনা। ছিমছাম সাজগোজে বাড়িটাকে যথেষ্ট আধুনিক করার চেষ্টা হয়েছে।

দরজা-জানলায় ভারী পরদা, দেওয়ালে ওয়াল হ্যাঙার, সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ পেইন্টেড পট।

এসব দেখতে-দেখতে অনুষ্কার ঘরে পৌঁছে গেল ইলিনা।

অনুষ্কা আলো জ্বালতেই ঘরটা চোখের সামনে প্রকাশিত হল।

একটা আলমারি, বুককেস, এল. সি. ডি টিভি আর পড়াশোনার টেবিল। তার পাশে কম্পিউটার টেবিল। ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে পাতা সিঙ্গল খাট। তার বিছানার রঙিন চাদর এলোমেলো। তার ওপরে পড়ে আছে একটা বড়সড় হেডফোন।

বিছানার একটু ওপরে দেওয়ালে জন আব্রাহাম আর মাইকেল জ্যাকসনের বিশাল পোস্টার। তার পাশেই একটা অন্যরকম ডিজিটাল প্রিন্ট।

এই অন্যরকম ছবিটায় দেখা যাচ্ছে, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্না ধোওয়া প্রান্তরে একটা বিশাল প্রাসাদ অতিকায় ডাইনোসরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রাসাদের একটা ঘরে শুধু আলো জ্বলছে—বাকিটা ছায়া-ছায়া অন্ধকার।

সেই ছবিটার পাশে একটা ছোট কাগজ দেওয়ালে সেলোটেপ দিয়ে লাগানো। তাতে লাল কালিতে একটা প্রতীক চিহ্ন আঁকা ঃ একটা ফুলকে ঘিরে দুটো সাপ; তাদের লেজের ডগা দুটো জড়াজড়ি করে আছে। এই ছবিটা ইলিনা আগে অনুষ্কার খাতায় দেখেছে।

হেডফোনটা ছুঁড়ে একপাশে সরিয়ে দিয়ে অনুষ্কা স্কুল-ব্যাগটা খুলে বিছানার কোণে রাখল। তারপর ধপাস করে বিছানায় বসে পড়ল, ইলিনাকেও বসতে বলল।

ইলিনা স্কুল-ব্যাগটা খুলে বিছানায় নামিয়ে রাখল। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল। কিন্তু বারবার ওর চোখ চলে যাচ্ছিল ফুল আর সাপের ছবিটার দিকে।

ইলিনা স্বপ্নেও ভাবেনি হঠাৎ করে এরকমভাবে অনুষ্কা ওকে এত কাছে টেনে নেবে। তাই একটা অপ্রত্যাশিত খুশির ঢেউ ওকে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। অনুষ্কার 'আহা মরি' মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা ওর কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওরা দুজনে প্রাণখোলা গল্পে মেতে উঠল। আর তারই মধ্যে কখন যেন ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

ওদের গল্প আর হাসাহাসির ঢেউয়ের মাঝে হঠাৎ করেই পরানের ডেডবডির কথা ভেসে উঠল।

অনুষ্কা টেলিফোনে ব্যাপারটা জেনেছে ঠিকই, কিন্তু মনে হল তাতে ওর কৌতূহল মেটেনি। কারণ, ও ইলিনাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নানান প্রশ্ন করতে লাগল।

সেই রাতের ঘটনা খুব ধীরে-ধীরে স্লো-মোশান সিনেমার মতো পরপর দুবার বলতে হল ইলিনাকে।

কপালে ভাঁজ ফেলে চোখ সরু করে গভীর মনোযোগে ইলিনার কথামালা শুনল অনুষ্কা।

'তোমরা ঠিক দেখেছ, দুজন টপ আর স্কার্ট পরে ছিল? মানে, আমাদের স্কুল ড্রেস?'

'হ্যাঁ, ঠিক দেখেছি।'

'আর-একজন শাড়ি?'

'হ্যাঁ। আমাদের একজন ম্যাডাম ওইরকম শাড়ি পরে সেদিন স্কুলে এসেছিল। পাড়ের ডিজাইনটা দেখে সম্পি চিনতে পেরেছে।'

'কোন ম্যাডাম?'

'সম্পি জানে। ও আমাদের এখনও বলেনি। লাস্ট দিন যখন ওর সঙ্গে কথা হয় তখন ও বলেছিল, ম্যাডামের নামটা এখন ও কাউকে বলবে না। কয়েকটা দিন ও ম্যাডামের ওপরে নজর রাখতে চায়...।'

এ-কথা শুনে অনুষ্কা বেশ চিন্তায় পড়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও আনমনাভাবে বলল, 'এতে তো সম্পির বিপদ হতে পারে! যদি সেই ম্যাডাম সম্পির ব্যাপারটা জানতে পেরে যায় তা হলে...।'

ইলিনা হাত নেড়ে বলল, 'জানলে জানবে! সম্পির গায়ে অনেক

জোর—ও কাউকে ভয় পায় না....।'

ইলিনার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাল অনুষ্কা। মলিন হেসে বলল, 'সম্পি ওদের সঙ্গে পারবে না। ওদের গায়ে অমানুষিক শক্তি। ওরা লোহা চিবিয়ে গুঁড়ো করে দিতে পারে—।'

ইলিনা অবাক হয়ে তাকাল ঃ 'তুমি জানলে কী করে?'

অনুষ্কা চুপ করে রইল। ওরা দুজনে বৃষ্টির ধারাপাত শুনতে লাগল। কিছুক্ষণ পর ইলিনা আবার জিগ্যেস করল, 'তুমি জানলে কী করে?'

'আমি জানি। সব জানি—।'

'কী জানো, বলো—।' অনুষ্কার আরও কাছে সরে এল ইলিনা।

'পরান ছেলেটা কীভাবে মারা গেছে আমি জানি।'

বাইরে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। পড়ল ইলিনার বুকের ভেতরেও। উত্তেজিত হৃৎপিণ্ডের ধকধক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল ও।

ফ্যালফেলে মুখে অনুষ্কার দিকে তাকিয়ে ছিল ইলিনা। হোঁচট খাওয়া গলায় কোনওরকমে প্রশ্ন করল, 'কী-কীভাবে ম্-মারা গেছে পরান?'

'ওর সব রক্ত শুষে নিয়েছে কেউ...।'

ইলিনার শীত-শীত করে উঠল।

ঘরের দুটো জানলাতেই কাচের শার্সি লাগানো। বৃষ্টির ফোঁটা কাচের ওপরে আছড়ে পড়ছিল। তারপর কাচ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। ল্যাম্পপোস্টের ছিটকে আসা আলোয় মনে হচ্ছিল কাচ বেয়ে কতকগুলো স্বচ্ছ ব্যাঙাচি সাঁতরে নামছে।

ইলিনা শুধু যে অনুষ্কার কথায় ভয় পেয়েছে তা নয়। অনুষ্কা কী করে এসব জানল সে-কথা ভেবেও ওর ভয় করছে। অথচ অনুষ্কার প্রতি ওর টানটাও তো মিথ্যে নয়! তাই ভয় পেলেও ইলিনা এক অদ্ভুত টানে অনুষ্কার কাছে বসে রইল, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আর নানান কথা ভাবতে লাগল।

তা হলে সেই ছাতাওয়ালা প্রাণী-গুলো পিশাচ? ওরাই কি পরানের রক্ত শুষে নিয়েছে? কিন্তু ওদের স্কুলের দুজন ছাত্রী আর একজন ম্যাডাম ওরকম পিশাচ হয়ে গেল কী করে?

ইলিনার চিন্তাগুলো দিশেহারাভাবে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল আর বারবার অদৃশ্য এক পাথরের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরছিল।

অনুষ্কা বলল, 'ইলিনা, তুমি ভয় পেয়ো না। আমি তো আছি! শুধু সম্পিকে বোলো খুব কেয়ারফুল থাকতে। ও যেন বেশি রিস্‌ক না নেয়।'

ইলিনা কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ঘাড় নাড়ল। দারচিনির মিষ্টি গন্ধটা ওর নাকে এল আবার।

অনুষ্কা প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য জানলার কাচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বৃষ্টিটা যে কখন থামবে কে জানে! রেইনি সিজ্‌নটা খুব বিচ্ছিরি।' মুখ ফিরিয়ে ইলিনার দিকে তাকাল ঃ 'আমার মায়ের সঙ্গে তোমার আলাপ হল না। মা বিকেলে কীসব কেনাকাটা করতে বেরিয়েছে—মনে হয়, বৃষ্টিতে আটকে গেছে। একটু পরে বাপি মা-কে ফোন করে দেখবে। যদি মায়ের ফিরতে প্রবলেম হয় তা হলে তোমাকে বাড়িতে ড্রপ করে বাপি মা-কে গিয়ে নিয়ে আসবে।'

'তোমার মা একা বেরিয়েছেন? রাত হয়ে গেলে যদি কোনও বিপদ-আপদ হয়! তার চেয়ে আমি এখনই চলে যাই—তোমার মা তা হলে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবেন....।'

'তুমি শুধু-শুধু চিন্তা করছ—' মিষ্টি করে হাসল অনুষ্কা ঃ 'বিপদ-আপদকে আমরা ভয় পাই না। তা ছাড়া বাপি এখুনি তোমার জন্যে স্ন্যাক্স-ট্যাক্স কিছু নিয়ে আসবে। আর বাড়িটাও তো তোমাকে ঘুরিয়ে দেখানো হয়নি—চলো।' অনুষ্কা ওর হাত ধরে টানল। তারপর ঘর ছেড়ে ওরা চলে এল বাইরে, অলিন্দে।

বাড়ির সব জায়গাতেই উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। সাদা টিউবলাইট অথবা নানান চেহারার সি. এফ. এল.। দোতলার ঘরগুলো দেখাতে-দেখাতে অনুষ্কা বলল, 'আমাদের বাড়ির দুটো ফ্লোর একই প্যাটার্নে তৈরি। একতলার দুটো ঘরে উলটোপালটা জিনিস বোঝাই করা আছে, আর থার্ড ঘরটায় আমার... পোষা....মানে, পেট্‌সরা থাকে। কাঠবিড়ালি, পায়রা, শালিখ, চড়ুই এসব।'

দোতলার তিনটে ঘর শেষ হতেই অনুষ্কা বলল, 'ওপাশে ওই যে দুটো ছোট-ছোট ঘর—ওগুলো টয়লেট আর কিচেন—দেখানোর কিছু নেই।'

ইলিনা জিগ্যেস করল, 'তুমি রান্না জানো?'

'ওরে বাবা!' ভয় পাওয়ার কপট ভঙ্গি করল অনুষ্কা ঃ 'রান্না-টান্না আমি একটুও জানি না।'

'তোমার মা—মানে, আন্টি নিশ্চয়ই ভালো রান্না জানেন?'

'উহুঁ—' অনুষ্কা মাথা নাড়ল ঃ 'মা রান্না-টান্না তেমন জানে না....।'

'সে কী? তা হলে রোজ রান্না করে দেয় কে? তোমার স্কুলের টিফিন কে তৈরি করে? রান্নার মাসি?'

অনুষ্কাকে দেখে মনে হল, ও কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গেছে। কী বলবে ভাবছে।

'না, মানে....রান্নার মাসি....আমাদের রান্নার মাসি-টাসি কেউ নেই।'

অনুষ্কার কথাটা শেষ হওয়ার আগেই রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়ে ভেতরে উঁকি মেরে দেখেছে ইলিনা।

এবং বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে।

রান্নাঘর একেবারে পরিষ্কার। কয়েকটা থালা-বাসন ছুরি-চামচ ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। তাকে মশলাপাতির কোনও কৌটো নেই। এমনকী কোনও উনুন, স্টোভ, গ্যাস আভেন, গ্যাস সিলিন্ডার, বা মাইক্রোওয়েভ আভেন—কিচ্ছু নেই।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে ইলিনা ঘুরে তাকাল বন্ধুর দিকে।

দুজনেই চুপচাপ। যেন ক্যামেরার ফ্রিজ শটে দুজনে ধরা পড়েছে। ওদের মুখে কোনও কথা নেই। শুধু বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতো বাজছিল।

'আমাদের রান্নাবান্নার কোনও ব্যাপার নেই। আমরা সবসময় কেনা খাবার খাই—।'

অনুষ্কা এ-কথা বলতে না বলতেই ওর বাপির গলা পাওয়া গেল। 'ইলিনা, এই কেনা খাবারগুলো খেয়ে দ্যাখো—দারুণ লাগবে। খুব ফেমাস দোকান থেকে কেনা....।'

কথার দিক লক্ষ্য করে চোখ ফেরাল ইলিনা। এবং সরাসরি অনুষ্কার বাবাকে দেখতে পেল।

অনুষ্কার ঘরের দরজায় বাপি দাঁড়িয়ে। হাতে একটা খাবারের প্লেট। ওরা বাপির কাছে এগিয়ে গেল। বাপি খাবারের প্লেটটা অনুষ্কার হাতে দিলেন ঃ 'নাও, বন্ধুকে ঘরে বসিয়ে খাওয়াও।' ইলিনার দিকে

তাকালেন ঃ 'লজ্জা কোরো না, ইলিনা—পেট ভরে খাবে। তা কেমন লাগছে বলো। এনজয় করছ তো?'

ইলিনা সামান্য হেসে ঘাড় নাড়ল। নীচু গলায় বলল, 'করছি—এনজয় করছি।'

'গুড—ভেরি গুড।' জোরে হেসে উঠলেন বাপি। তারপর চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন ঃ 'হ্যাঁ, ভালো কথা। তুমি ফেরার সময় হলে বোলো। তোমাকে বাড়িতে ড্রপ করে দেব....।'

বাপি সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করলেন।

ঘরে ঢুকে ইলিনার সামনে প্লেটটা এগিয়ে দিল অনুষ্কা ঃ 'নাও—খেয়ে নাও।'

ইলিনা প্লেটটা নিয়ে বিছানায় বসল। ওর খুব খিদে পাচ্ছিল। খাবারগুলো সামনে পেয়ে খিদেটা যেন অনেক বেড়ে গেল। মন্‌জিনিসের ফিশ এনভেলাপ, চিকেন বার্গার—তার পাশে দুটো বড় সন্দেশ।

খাওয়া শুরু করার আগে ও অনুষ্কাকে জিগ্যেস করল, 'তুমি খাবে না?'

ইলিনা জানত অনুষ্কা কী বলবে। কারণ, স্কুলে টিফিন শেয়ার না করার ব্যাপারটা ওর মনে ছিল।

অনুষ্কা ঠিক তাই বলল, 'নাঃ, আমার খিদে নেই—।'

ইলিনা চিকেন বার্গারে কামড় বসিয়ে হাসল ঃ 'তোমার দেখছি কখনও খিদে-টিদে পায় না।'

অনুষ্কা অস্বস্তি পেয়ে হাসল, বলল, 'বোধহয় তাই। ডাক্তার দেখাব ভাবছি—।'

এরপর ওদের গল্প ঘুরে গেল গানের দিকে। বাইরে বৃষ্টির শব্দ তখন অনেকটা কমে এসেছে।

অনুষ্কা যে মাইকেল জ্যাকসনের ভক্ত সেটা দেওয়ালের পোস্টারটা দেখেই বোঝা গিয়েছিল। তার সঙ্গে জানা গেল ও নিজেও হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানের চর্চা করে।

ইলিনার গানের 'চর্চা' বলতে শুধু গান শোনা। ওর প্রিয় বিষয় হল ছবি আঁকা আর ট্যাটুর ডিজাইন। দেওয়ালে লাগানো পূর্ণিমার রাতের ছবিটা অনেকক্ষণ ধরেই ওর চোখ টানছিল। তাই ও হঠাৎই জিগ্যেস

করল, 'এই ছবিটা এখানে কী জন্যে লাগিয়েছ? এটার কি স্পেশাল কোনও ব্যাপার আছে?'

অনুষ্কা ছবিটার দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে বলল, 'না, মানে...স্পেশাল কোনও ব্যাপার নেই। ছবিটা আমার ভালো লাগে, তাই—।'

'ওরে বাবা, আমার তো ওটার দিকে তাকালেই গা-টা কেমন শিরশির করছে! ভয়-ভয় করছে। ওই বাড়িটা যেন কেমন।'

হাসল অনুষ্কা ঃ 'আমার ভয়-টয় একটু কম...।'

অনুষ্কার দিকে তাকিয়ে রইল ইলিনা। হঠাৎই ওর মনে একটা প্রশ্ন উঠে এল।

অনুষ্কা ওকে আজ হঠাৎ বাড়িতে 'নেমন্তন্ন' করল কেন? আগে ও যখন গায়ে পড়ে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গেছে তখন অনুষ্কা এতটুকুও আগ্রহ দেখায়নি। অথচ আজ হঠাৎ উলটো ব্যাপার।

তা হলে কি অনুষ্কা স্কুলের ওই ভয়ানক কাণ্ডটা ইলিনার কাছ থেকে সামনাসামনি বসে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শুনতে চেয়েছিল? সব শোনার পর সেটা নিয়ে গোয়েন্দার মতো অনেক প্রশ্নও করেছে ও। ওর কথাবার্তায় ইলিনার মনে হয়েছে অনুষ্কা যেন এই রহস্যের গভীর পর্যন্ত জানে। কারণ, ও বলেছে, 'আমি জানি। সব জানি—।'

খাওয়া শেষ করে ইলিনা উঠে দাঁড়াল। পড়ার টেবিলে রাখা একটা জলের বোতল ওর দিকে এগিয়ে দিল অনুষ্কা। আলতো গলায় বলল, 'তুমি খুব সাবধানে থেকো।'

ঢকঢক করে জল খেল ইলিনা। তারপর বিছানা থেকে ওর স্কুল ব্যাগটা তুলে নিল ঃ 'রাত হয়ে যাচ্ছে—এবার আমি যাই...।'

ঘর থেকে বেরিয়ে ওরা দুজনে সিঁড়ির দিকে এগোল।

॥ ছয় ॥

অনুষ্কাকে ঘিরে ইলিনার মনে কিছু প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা আর রহস্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ওর প্রতি অলৌকিক এক টান এইসব দ্বিধা আর সংশয়কে ফিকে করে দিয়েছিল। শুধু একটা কথা ওর কানে বারবার বেজে উঠছিল : 'আমি জানি। সব জানি—।'

ক্লাসের পড়ায় ইলিনার মন বসছিল না। ও একটা খাতার শেষ পাতায় একটা ট্যাটুর ডিজাইন আঁকছিল : একটা ফুল—তাকে ঘিরে দুটো সাপ। এই নকশাটার মধ্যে কী আছে কে জানে! এটা অনুষ্কার এত প্রিয় কেন?

ইলিনা আজ সমর্পিতা আর সজনীর মাঝে বসেছে। ক'দিন ধরেই তাই বসছে। সমর্পিতার পাশে বসলে ও কেমন যেন ভরসা পায়। ওর মনে হয়, কোনও বিপদ-আপদ হলে দশাসই সম্পি সেটা ঠিক রুখে দেবে। কিন্তু ঠিক কীরকম বিপদ-আপদ সেটা ইলিনা জানে না।

অরুণিমা ম্যাডাম বাংলা ব্যাকরণ পড়াচ্ছিলেন। ওঁর ভীষণ রোগা চেহারা, মাথায় অনেক সাদা চুল। খুব শিগগিরই রিটায়ার করে যাবেন। ক্লাসে শুধু হাই তোলেন আর চেয়ারে বসে মাঝে-মাঝেই ঘুমিয়ে পড়েন।

অরুণিমা ম্যাডাম খুব ঠান্ডা আর ভালোমানুষ টাইপের। পড়া না পারলে শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা বকাবকিও করেন না। শুধু ক্লাসে গোলমাল না করলেই হল।

সেই 'নিয়ম' মেনে ইলিনারা চাপা গলায় কথা বলছিল।

ইলিনা ট্যাটু আঁকা থামিয়ে হঠাৎ বলল, 'সম্পি, তোর সেই শাড়ির পাড়ের ডিজাইনের গল্পটা তো দেখলাম অনেকেই জেনে গেছে। বড়দিকে তুই কী বলেছিলি মনে নেই—যে সবটাই তোর দেখার ভুল?'

সম্পি বাঁকাভাবে হাসল। বলল, 'সবাই যা বলে তাই করে নাকি? আমি ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা একটু রটিয়ে দিয়েছি।'

সজনী জিগ্যেস করল, 'কেন রে?'

'যাতে কথাটা সেই শয়তান ম্যাডামের কানে যায়। তা হলে সেই ম্যাডাম একটু চাপে থাকবে।'

'চাপে থাকলে কী হবে?'

'দেখাই যাক না কী হয়।' ঠোঁট টিপে বলল সম্পি, 'হয়তো শয়তান ম্যাডামটা চালে কোনও ভুল করে ফেলতে পারে...।'

হঠাৎই সম্পি প্রসঙ্গ পালটে ইলিনাকে জিগ্যেস করল, 'সেদিন দেখলাম তুই ছুটির সময় অনুষ্কার গাড়িতে উঠলি...।'

ইলিনা অপ্রস্তুতভাবে বলল, 'আমার শরীরটা ভালো লাগছিল না। ওকে বলেছিলাম—তাই ও আমাকে বাড়ির কাছে নামিয়ে দিয়েছে।'

'ওরা খুব বড়লোক, না রে?' সজনী গলা বাড়িয়ে জিগ্যেস করল।

'কী জানি!' ঠোঁট ওলটাল ইলিনাঃ 'তবে অনুষ্কা বলছিল, ও সব জানে। ও তোকে—' সম্পির দিকে তাকাল ইলিনাঃ 'খুব কেয়ারফুল থাকতে বলেছে, কোনও রিস্‌ক নিতে বারণ করেছে।'

সম্পি এ-কথায় ভয় তো পেলই না, উলটে 'ডোন্ট কেয়ার' হাসি হাসল। তারপর কৌতূহল নিয়ে জিগ্যেস করল, 'অনুষ্কা সব জানে মানে?'

'কী জানি! সেসব ক্লিয়ার করে বলেনি।'

'তোরা চিন্তা করিস না। ব্যাপারটার পেছনে আমি লেগে আছি।'

'তুই কিন্তু কেয়ারফুল থাকিস...।' ইলিনা ফিসফিস করে সম্পিকে আবার বলল।

সম্পি কোনও কথা বলল না। শুধু চোখের ইশারায় বোঝাল, ও কেয়ারফুল থাকবে।

বাংলা ব্যাকরণের পর আরও দুটো ক্লাস পার হয়ে গেল। সম্পি কেমন যেন ছটফট করছিল। কোনও কিছুতেই ঠিকমতো মন বসাতে পারছিল না।

ইলিনা খেয়াল করেছে, সম্পি ক'দিন ধরেই স্কুল ক্যাম্পাসের আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই মরা গাছটার কাছে গিয়ে তার আশপাশটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে। গত পরশু স্কুল ছুটি হওয়ার পর ও সার্ভেন্ট্‌স কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বলাইদার সঙ্গে কীসব যেন কথাবার্তা বলছিল। তারপর গতকাল টিফিনের সময় আগাছার জঙ্গলের

মধ্যে ঢুকে এদিক-ওদিক চষে বেড়াচ্ছিল।

ব্যাপারস্যাপার দেখে ইলিনার মনে হচ্ছিল, সমর্পিতা যেন শখের গোয়েন্দা হয়ে উঠেছে। এটা যেমন ইলিনাদের চোখে পড়ছে তেমন অন্যদেরও নিশ্চয়ই চোখে পড়ছে। তা হলে সেই রাতের ওই ভয়ংকর তিনজন...তারাও নিশ্চয়ই সমর্পিতার পাগলামো দেখছে। তারপর যদি...।

ইলিনা আর ভাবতে পারছিল না। অনুষ্কার রহস্যময় কথাগুলো ওর মাথার ভেতরে ঝড় তুলছিল।

টিফিনের পরের পিরিয়ডটায় রনিতা ম্যাডামের ইতিহাস। তিনি ক্লাসে এসে নিজস্ব বিরক্তিকর স্টাইলে পড়াতে লাগলেন। তারপর আজকের 'বলির পাঁঠা' হিসেবে সম্পিকে বেছে নিলেন। যত কঠিন-কঠিন প্রশ্ন ওর দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

সম্পি প্রায় কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারছিল না। ফলে ওকে হেনস্থা করার সাফল্যে রনিতা ম্যাডামের চোখ চকচক করছিল।

সমর্পিতাকে বাঁচানোর জন্য অনুষ্কা বারবার উত্তর দিতে চেয়ে হাত তুলছিল, কিন্তু রনিতা ম্যাডাম সেটা যেন দেখেও দেখছিলেন না।

একসময় তিনি ঠান্ডা চোখে অনুষ্কার দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধারালো গলায় কেটে-কেটে বললেন, 'আমি জানি তুমি সব জানো। কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমি কিছু জানতে চাইছি না।'

সম্পিকে যাচ্ছেতাইভাবে নাস্তানাবুদ করার পর ওকে ভালোরকম বকাবকি করলেন রনিতা ম্যাডাম। তারপর বললেন, 'তুমি ছুটির পর আমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমাকে ঠিক পথে আনা দরকার...।'

সম্পি উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে ঘাড় নাড়ল।

ইলিনা লক্ষ করল, সম্পির মুখচোখ লাল। প্রায় কাঁদোকাঁদো অবস্থা।

রনিতা ম্যাডাম চলে যাওয়ার পর সম্পি ইলিনাকে বলল, 'সবাই জানে আমি পড়াশোনায় বাজে...তাও কেন যে আমাকে রনিতা ম্যাডাম হ্যারাস করলেন কে জানে! আমার কপালে নির্ঘাত গার্জেন কল ঝুলছে।'

ইলিনা আর সজনী ওকে ভরসা দিতে লাগল।

আকাশে কালো-কালো মেঘের ছানা ভেসে বেড়াচ্ছিল। বৃষ্টি এখনও শুরু হয়নি—তবে যে-কোনও সময় শুরু হতে পারে। জানলা দিয়ে বড়-বড় গাছের মাথাগুলো দেখা যাচ্ছিল। এলোমেলো বাতাসে এপাশ-ওপাশ

মাথা নাড়ছে।

সম্পিকে দেখে মনে হল, ও যেন একটু দমে গেছে। চুপচাপ কী যেন ভাবছে।

ইলিনা বারবার ওকে জিগ্যেস করল, 'কী রে, কী হয়েছে?'

সমর্পিতা অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল, বলল, 'না, কিছু না...।'

ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ইলিনা। ওর মনে হল, ডাকাবুকো সম্পি ভয় পেয়েছে।

শেষ পিরিয়ড শুরু হওয়ার আগে সম্পি একবার টয়লেটে যাওয়ার নাম করে বেরোল।

ইলিনার কী মনে হল, সম্পির পিছন-পিছন ও-ও বেরিয়ে এল বারান্দায়। দেখল, সম্পি বারান্দার রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে ক্লাস নাইন-বি-র একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে।

মেয়েটার নাম নিনা। সম্পিদের পাড়ায় থাকে—ওর বন্ধুও। আর সম্পির মতো নিনারও একটু ভয়ডর কম।

ইলিনা চটপট ক্লাসে ফিরে এল আবার। একটু পরে সম্পি ফিরে এসে ওর পাশে বসল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শম্পা ম্যাডাম ক্লাসে ঢুকে পড়েছেন।

শম্পা ভূগোল পড়ান এবং খুব ভালো পড়ান। কিন্তু শেষ পিরিয়ডে ইলিনার হাই উঠছিল। ভাবছিল কখন ছুটি হবে, স্কুল বাসে করে বাড়ি যাবে।

ও সম্পিকে বলল, 'নিনার সঙ্গে কী কথা বলছিলি?'

সম্পি কী যেন চিন্তা করছিল, চটকা ভেঙে বলল, 'রনিতা ম্যাডামের কাছে যাওয়ার সময় ওকে সঙ্গে নেব ভেবেছিলাম। তাই ওকে বলছিলাম। কিন্তু ওর কাজ আছে—বাড়ি ফেরার তাড়া আছে...।'

'ওকে সঙ্গে নিবি কেন?'

'না, মানে...যদি কোনও প্রবলেম হয়...।'

'কী প্রবলেম?'

'যদি বকাবকি করে, মারধর করে...তারপর গার্জেন কল...।' একটু থেমে সম্পি আবার বলল, 'যাকগে, যা হয় হবে।'

'আমি তোর সঙ্গে যাব?' ইলিনা জিগ্যেস করল।

সমর্পিতা একলহমা কী যেন ভাবল, তারপর বলল, 'নাঃ, থাক—দরকার নেই। দেখি না কী হয়!'

এরপর ও আর কোনও কথা বলল না। অন্যমনস্কভাবে শম্পা ম্যাডামের ভূগোল পড়ানো শুনতে লাগল।

ইলিনা বুঝতে পারছিল, সম্পি কেমন একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে। কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না।

কিন্তু কোনও টিচার পড়া না পারার জন্য সম্পিকে টিচার্স রুমে ডেকে পাঠাচ্ছেন এটা তো সম্পির কাছে নতুন নয়! তা হলে ও এরকম ঘাবড়ে যাচ্ছে কেন?

এসব ভাবতে-ভাবতে ইলিনা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। আকাশের কালো-কালো মেঘের ছানাগুলো কখন যেন একজোট হয়ে পড়েছে। এখন ওদের কালো দৈত্যের মতো দেখাচ্ছে। ওদের ঘন কালো শরীর ভেদ করে বিদ্যুতের রুপোলি তরোয়াল মাঝে-মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। আর তারপরই গম্ভীর চাপা গর্জন।

কখন যেন ছুটির ঘণ্টা পড়ল। গোটা ক্লাস সঙ্গে-সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল। কথার ফুলঝুরি ছিটকে পড়তে লাগল চারিদিকে।

বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই বাড়ি রওনা হতে হবে এই চিন্তায় সবাই তাড়াহুড়ো শুরু করে দিল। কিন্তু সম্পি চুপচাপ বসে রইল। ধীর স্থির গম্ভীর।

ইলিনা আর সজনী ক্লাস ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে সম্পির দিকে একবার তাকাল। ইলিনা জিগ্যেস করল, 'কী রে, তোর সঙ্গে থাকব?'

'না, না—তুই বাড়ি যা।' চটপট বলল সম্পি, 'আমি একা ম্যানেজ করে নেব।'

ইলিনার মনে হল, সমর্পিতা চায় না ওকে কেউ ভিতু বলুক। ও এখন মনের ভেতরে বাড়তি সাহস তৈরি করছে।

ক্লাস রুম যখন ফাঁকা হয়ে গেল তখন সম্পি উঠে দাঁড়াল। ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে চলে এল বাইরের অলিন্দে। অলিন্দ ধরে খানিকটা এগোলেই একটা বড় চৌকো চাতাল। তাকে ঘিরে কাস্ট আয়রনের ঢালাই করা



'...তুমি খাবে না?...'

নকশা কাটা রেলিং।

দোতলার এই চাতালটাকে অনেকটা ছাদের মতো দেখায়। চাতালের গা ছুঁয়ে একটা কৃষ্ণচূড়া আর একটা কাঁঠাল গাছ উঠেছে।

চাতালের একপাশে বেশ বড়সড় টিচার্স রুম। সম্পি কোনাকুনিভাবে চাতালটা পেরিয়ে টিচার্স রুমের কাছে গেল। তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

রুমের চওড়া দরজায় বাদামি রঙের ভারী পরদা ঝুলছে। পরদার পাশ দিয়ে ঘরটা একচিলতে দেখা যাচ্ছে। আর ভেতর থেকে কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল সমর্পিতা। নিজেকে সাহস জোগানোর আপ্রাণ চেষ্টা করল। রনিতা ম্যাডাম আর যা-ই করুন নিশ্চয়ই মারধোর করবেন না!

বুকের ভেতরে ধকধক শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সম্পি। ওর হাত সামান্য কাঁপছে নাকি?

দুর! যা হয় হবে!

এক হাতে ভারী পরদা সরাল ও। তারপর জুতোয় শব্দ তুলেই ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ঘরে মাত্র দুজন টিচার ঃ রনিতা ম্যাডাম আর রবিনা ম্যাডাম। ওঁরা পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে হোম লোন আর ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্ট নিয়ে কীসব আলোচনা করছিলেন। সমর্পিতাকে দেখেই ওঁরা চুপ করে গেলেন। তারপর রনিতা বললেন, 'এসো, সমর্পিতা, এসো....।'

রবিনা ম্যাডাম উঠে দাঁড়ালেন। ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে সমর্পিতা ছোট্ট করে হাসল। কিন্তু ম্যাডাম ওর দিকে তাকালেন শুধু—হাসলেন না। টেবিলে রাখা নস্যি রঙের কাঁধব্যাগটা তুলে নিয়ে চুপচাপ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ওঁর হাবভাব দেখে মনে হল তিনি যেন সমর্পিতার ঘরে ঢোকার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। নিশ্চয়ই রনিতা ম্যাডাম ওঁকে বলে রেখেছিলেন যে, সম্পিকে তিনি কথা বলার জন্য টিচার্স রুমে ডেকে পাঠিয়েছেন।

টিচার্স রুমে ঢুকে সবচেয়ে প্রথমে যেটা চোখে পড়ে সেটা হল প্রকাণ্ড একটা টেবিল। টেবিলটা প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া। মেহগনি

কাঠের তৈরি, ঝকঝকে পালিশ। টেবিলের আটটা পায়া আটটা সিংহের থাবা। টেবিলের নানান নকশা আর কারুকাজ দেখে বোঝা যায় এ-টেবিল ব্রিটিশ আমলের কনফারেন্স টেব্‌ল।

ঘরের একপাশে চারটে কাঠের আলমারি, আর তার পাশে একটা স্টিলের আলমারি।

তার ঠিক বিপরীতে একটা কাঠের র‍্যাক—তাতে অনেকগুলো ক্লাস রেজিস্টার, চকের বাক্স আর ডাস্টার। র‍্যাকের পাশে বড়-বড় তারিখওয়ালা একটা ক্যালেন্ডার।

ঘরে তিনটে চার ব্লেডের সিলিং ফ্যান—তবে এখন একটা চলছে। তার হাওয়ায় রনিতা ম্যাডামের কানের পাশে চুল উড়ছে।

আকাশ মেঘলা থাকায় ঘরে দুটো টিউবলাইট জ্বলছে। রনিতা ম্যাডামের পিছনে তিনটে বিশাল-বিশাল জানলা—সম্পিদের ক্লাসরুমের মতো। খোলা জানলা দিয়ে আকাশের মেঘ দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গে বাতাসে মাথা ঝাঁকানো পাগল গাছপালা।

কোকিলের ডাক শুনতে পেল সম্পি। এই ডাকটা ওকে যেন ভরসা জোগাল।

সম্পি টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বসেনি। কারণ, ম্যাডাম ওকে বসতে বলেননি।

টেবিলের এপার থেকে ও রনিতা ম্যাডামকে দেখছিল।

রনিতা ম্যাডামের সামনে তিন-চার ভাগে ভাগ করে রাখা ক্লাস টেস্টের খাতা। খাতার ওপরে লোহার পেপার-ওয়েট চাপানো। খাতার পাতার কোনাগুলো পাখার হাওয়ায় উড়ছে।

খাতাগুলোর পাশে রনিতার কাঁধ-ব্যাগ। গাঢ় নীল রঙের ব্যাগ—ব্যাগের খোলা মুখ দিয়ে ছাতার রঙিন বাঁট দেখা যাচ্ছে।

'এদিকে এসো, সমর্পিতা—এপাশটায় এসো....।' হাতের ইশারায় ওকে নিজের কাছে ডাকলেন ম্যাডাম।

'না, ম্যাডাম—এখানেই ঠিক আছি।' কথা বলতে-বলতে হাতে ঝোলানো স্কুল-ব্যাগটা টেবিলের ওপরে রাখল সম্পি।

হাসলেন রনিতা ম্যাডাম। বললেন, 'কোনও ভয় নেই, সমর্পিতা—এপাশটায় এসো, আমার কাছে এসো। তোমাকে আমি কানও মুলব না,

মারধোরও করব না। তবে হ্যাঁ—' চওড়া করে হাসলেন রনিতা ঃ 'একটু বকাবকি হয়তো করব। এসো... এপাশটায় এসো—।'

এরপর আর আপত্তি করা যায় না।

টেবিলের পরিসীমা ধরে ধীরে-ধীরে এগোতে শুরু করল সমর্পিতা। ম্যাডাম মুখে বলছেন বটে 'কোনও ভয় নেই', কিন্তু যদি রাগের মাথায় কান-টান মুলে দেন! তা হলে কিন্তু বড় প্রেস্টিজের ব্যাপার হবে।

'আজকাল তোমার পড়াশোনায় একটুও মন নেই কেন বলতে পারো?' বকুনির পালা শুরু করে দিলেন রনিতা ঃ 'ক্লাসে সবসময় দেখি অন্যমনস্ক। এরকম করলে তো তোমার রেজাল্ট অনেক নীচে নেমে যাবে!'

সমর্পিতা ততক্ষণে ম্যাডামের বেশ কাছে পৌঁছে গেছে—তবে মোটেই হাতের নাগালের মধ্যে নয়। কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে ও ম্যাডামের ভর্ৎসনা গায়ে মাখছিল।

'আজও ক্লাসে দেখলাম তুমি কোনও পড়া বলতে পারছ না। ইতিহাস বলে যে একটা সাবজেক্ট আছে সেটাই বোধহয় তুমি ভুলে গেছ।' কথা বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন রনিতা ঃ 'সত্যি করে বলো তো, তোমার কী প্রবলেম হয়েছে? লেখাপড়া ছেড়ে তুমি এখন কী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ?'

সমর্পিতা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। মিনমিনে গলায় বলল, 'কিছু নিয়ে তো মাথা ঘামাচ্ছি না, ম্যাডাম—পড়ছি.....।'

'ছাই পড়ছ!' ধমকে উঠলেন রনিতা, 'আসলে তুমি স্কুলের ওই অ্যাক্সিডেন্টটা নিয়ে বড্ড বেশি ইনভল্‌ভ্‌ড হয়ে পড়েছ, তাই না?'

সমর্পিতা চুপ করে রইল।

জানলার বাইরে মেঘ ডাকল। বৃষ্টিও জোরে শুরু হল। রনিতা বৃষ্টির শব্দে জানলার দিকে একবার তাকালেন। তারপরই ব্যাগ থেকে ছাতাটা টেনে বের করে নিজের হাতের কাছে রাখলেন।

সম্পিকে চুপ করে থাকতে দেখে ম্যাডামের ধৈর্য কয়েক ডিগ্রি কমে গেল।

'চুপ করে আছ কেন? বলো। পরানের অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথটা নিয়ে তুমি একটু বাড়াবাড়ি রকমের ইনভল্‌ভ্‌ড হয়ে পড়েছ না?'

সমর্পিতা আর চুপ করে থাকতে পারল না। আলতো গলায় বলল, 'ম্যাডাম, ওটা অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ নয়—মার্ডার।'

'তোমাকে কে বলেছে মার্ডার?' ধৈর্য আরও কমে গেল : 'পুলিশ ইনভেস্টিগেট করে যা রিপোর্ট দেওয়ার দিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া সবাই জানে এই স্কুলটা একটু ইয়ে...মানে, ভূতুড়ে... একটু দোষ আছে। আর সেদিন রাতে তুমি বা রবিনা যা দেখেছ সবটাই—।'

'হ্যালুসিনেশান। আমাদের দেখার ভুল—তাই তো?' ম্যাডামের কথার খেই ধরে সমর্পিতা বলল।

সম্পির কথার সুরে ব্যঙ্গ আর বিদ্রোহের ছোঁয়া পেয়ে রনিতা খেপে উঠলেন : 'তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়! শিক্ষা-দীক্ষা পাওনি? বাজে নোংরা মেয়ে!'

সম্পির মাথায় আগুন জ্বলে গেল। ও ভুলে গেল কাকে কী বলছে। ক্ষিপ্ত গলায় ও চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি বাজে নোংরা মেয়ে! তুই কী? তোর সেই শাড়িটা কোথায়? ওই যে, পাড়ের কাছে শঙ্খের ডিজাইন করা। যেটা পরে সেদিন অন্ধকারে ছাতা মাথায় দিয়ে ওই মরা গাছটায় হনুমানের মতো লাফাচ্ছিলি। শাড়িটা আছে, না পুড়িয়ে ফেলেছিস?'

ঘরের ভেতরে যেন বাজ পড়ল। সম্পির কথাগুলো বুলেটের মতো বিঁধে গেল রনিতা ম্যাডামের গায়ে।

॥ সাত ॥

ওঁর মুখটা অলৌকিকভাবে পালটে যেতে লাগল। গাল দুটো বসে গেল। রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ঠোঁটজোড়া টুকটুকে লাল। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গিয়ে দুটো কালো অন্ধকার গর্ত তৈরি হল। সেই গর্তের কেন্দ্রবিন্দুতে দুটো উজ্জ্বল সাদা ফুটকি—হাই পাওয়ারের জোনাকির মতো জ্বলছে।

রনিতা ম্যাডাম অদ্ভুত এক কর্কশ গলায় বললেন, 'তোর লপচপানি বড্ড বেড়েছে। তোকে ঠিক পথে আনা দরকার। আমাদের যে কতটা শক্তি তুই জানিস না....।'

সম্পি ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। গল্পে পড়া কিংবা সিনেমায় দেখা আজগুবি ব্যাপারটা যে ওর চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে সেটা কিছুতেই ও বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওর ভেতর থেকে সমস্ত বেপরোয়া ভাব আর সাহস চুঁইয়ে-চুঁইয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ভয়ে ওর জিভ শুকিয়ে গেছে, পা দুটো মেঝেতে এঁটে বসেছে।

খপ করে হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা একটা পেপারওয়েট তুলে নিলেন রনিতা। ওঁর হাতের আঙুলগুলো কেমন কালো-কালো হাড্ডিসার হয়ে গেছে। আর আঙুলের নখগুলো এখন কেমন লম্বা আর বাঁকানো।

রনিতা খলখল করে হাসলেন। তারপর কর্কশ গলায় বললেন, 'এটা খুব ছোঁয়াচে রোগ। কী করে কখন যে হয়ে গেছে একটুও টের পাইনি। তোর গায়ে একটা কামড় বসালে তুইও একপলকে আমাদের মতন হয়ে যাবি। তখন তেষ্টায় পাগল হয়ে ঘুরবি... আর যদি মরণকামড় দিই তা হলে তুই পরানের মতো শেষ হয়ে যাবি। সে-রাতে পরানকে শুষে শেষ করে আমরা আনন্দে ওই মরা গাছটায় নাচানাচি করছিলাম। তুই কি চাস আরও একবার তাই করি?'

আকাশে এমনভাবে বিদ্যুৎ চমকাল যেন মেটাল হ্যালোজেন বাতি

ঝলসে উঠল। সমর্পিতা আর রনিতা ম্যাডামের মুখে-গায়ে সাদা আলো ঝিলিক মেরেই মিলিয়ে গেল।

সমর্পিতা অনেক কিছুই করার কথা ভাবছিল, কিন্তু কোন এক অলৌকিক অভিশাপ ওকে যেন পায়ে পেরেক ঠুকে মেঝেতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

ও একবার খোলা দরজার দিকে তাকাচ্ছিল, আর-একবার জানলার দিকে। ও কি একছুটে বাইরের চাতালে চলে যেতে পারবে? তারপর চেঁচিয়ে লোক জড়ো করতে পারবে না? কিন্তু এখন কি ম্যাডামরা কেউ আছেন? বড়দিও হয়তো বাড়ি চলে গেছেন। এখন শুধু সার্ভেন্ট্স কোয়ার্টারের লোকজনই যা ভরসা। কিন্তু এখান থেকে চিৎকার করলে সেই আওয়াজ কি সার্ভেন্ট্স কোয়ার্টার পর্যন্ত পৌঁছবে? এই বৃষ্টিতে কেউ কি আসবে?

সম্পি পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছিল। ওই তো, রনিতা পিশাচটা খলখল করে হাসছে। ওকে ঠেকাতে কিছু একটা করতে হবে, করতেই হবে।

সম্পি হঠাৎ কোথা থেকে শক্তি খুঁজে পেল কে জানে! ও দু-হাতের দুটো প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিল টেবিলে। ভয়ংকর শব্দ হল। বিশাল টেবিলটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

আর রনিতা ব্যঙ্গের হাসি হেসে উঠলেন। তারপর বড় করে হাঁ করলেন।

টিউবলাইটের আলোয় পিশাচের দাঁতগুলো ঝিকিয়ে উঠল। সম্পির দেখতে কোনও অসুবিধে হল না।

রনিতার দু-পাটিতেই হাঙরের মতো কয়েক সারি করে ইস্পাতের দাঁত। ঝকঝকে এবং ছুঁচলো।

পপকর্ন খাওয়ার ভঙ্গিতে লোহার পেপারওয়েটটা হাঁ করা মুখের ভেতরে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর কড়মড়-কড়মড় করে ওটা চিবোতে লাগলেন। ঠিক যেন তালমিছরির ডেলা চিবিয়ে গুঁড়ো করছেন।

একটু পরেই লোহার গুঁড়ো থু-থু করে টেবিলে উগরে দিলেন রনিতা। তারপর পাতলা ঠোঁটের ওপরে কয়েকবার জিভ বুলিয়ে নিয়ে সম্পিকে লক্ষ্য করে হাসলেন।

সম্পির শিরদাঁড়া বেয়ে বরফজলের স্রোত নেমে গেল। এই পিশাচের

সঙ্গে শক্তিতে পেরে ওঠা অসম্ভব। সম্পি একমাত্র পালানোর চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু পা দুটো যে কিছুতেই নড়তে চাইছে না!

টেবিলে ঘুসি মারার পর থেকেই সম্পির দু-হাতের মুঠো ব্যথা করছিল। ও হাত কচলে ব্যথা তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ভয়...ভয়টা তাড়ানো যায় কেমন করে?

রনিতা ঘষা-ঘষা গলায় বললেন, 'শোন মেয়ে, এই মুহূর্তে তুই যা-যা দেখছিস সবই তোর দেখার ভুল। এ-কথা মনে থাকে যেন! সব হ্যালুসিনেশান।' তারপর একটু রাগী কর্কশ স্বরে বললেন, 'তোর সাহস তো কম নয়! আমাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে আসিস! এই দেখ....।'

সমর্পিতাকে দিশেহারা কাবু অবস্থায় পেয়ে রনিতা যেন বেশ মজা পেয়ে গেছেন। ঠোঁটজোড়া ছুঁচলো করে টিউবলাইটগুলোর দিকে একবার তাকালেন। তারপর ক্ষণপ্রভার গতিতে চোখের পলকে পৌঁছে গেলেন দেওয়ালে গাঁথা ইলেকট্রিক ওয়্যারিং-এর কাছে। তারগুলোর ওপরে হিংস্র কামড় বসিয়ে দিলেন।

আলোর ফুলকি ছিটকে বেরোল। 'ফট' করে একটা শব্দ হল। এবং ঘরের আলো নিভে গেল। ঘুরন্ত পাখার গতি কমতে লাগল।

ঘরটা কেমন অদ্ভুত আঁধারে ছেয়ে গেল। জানলার বাইরে মেঘ আর বৃষ্টি যেন অকালসন্ধ্যা তৈরি করে দিয়েছে। সম্পির চোখের সামনে রনিতা ম্যাডামের অপচ্ছায়া। তাঁর চোখের অন্ধকার কোটরে দুটো সাদা আলোর বিন্দু ধকধক করে জ্বলছে। আর একইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে চাপা খিলখিল হাসি।

কর্কশ গলায় পিশাচটা বলল, 'এবার বুঝেছিস, আমাদের কী শক্তি! আজকের এসব ব্যাপার কাউকে বলবি না। কাউকে না। যদি বলিস, তা হলে—যা বললাম—তুইও পরানের মতো হয়ে যাবি...।'

এমন সময় তীব্র বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। পরক্ষণেই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল।

সেই কানফাটানো আওয়াজে সম্পির আতঙ্কের ঘোরটা হঠাৎই কেটে গেল। ও 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করতে শুরু করল এবং কোন এক শক্তিতে খোলা দরজার দিকে মরণপণ ছুট লাগাল।



'...আমাদের যে কতটা শক্তি তুই জানিস না...'

পিশাচটা ছুটন্ত সম্পিকে লক্ষ্য করে লাফ দিল। দু-লাফে পৌঁছে গেল দরজার কাছে।

কিন্তু সম্পি ততক্ষণে বাইরের চাতালে এসে পড়েছে। ঝুপুস বৃষ্টি ওকে যেন হারানো শক্তি ফিরিয়ে দিল। ও ফিরে তাকাল টিচার্স রুমের দরজার দিকে।

রনিতা ম্যাডাম সম্পিকে তাড়া করার ঝোঁকে টিচার্স রুম ছেড়ে চাতালে এসে পড়েছিলেন। কিন্তু বৃষ্টির জল গায়ে পড়তেই আঁতকে উঠলেন। এমনভাবে কাতরে উঠলেন যেন বৃষ্টির ফোঁটায় গায়ে ফোসকা পড়ছে।

যন্ত্রণার 'উঃ! আঃ!' শব্দ করে রনিতা একলাফে টিচার্স রুমে আবার ঢুকে গেলেন।

সম্পি সেটা দেখে অবাক হয়ে অঝোর বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল। বৃষ্টির জলে কী এমন শক্তি আছে যে, এই পিশাচগুলো বৃষ্টির জলের 'জ্বালা' সইতে পারে না?

টিচার্স রুম এখন বেশ অন্ধকার। তাই রনিতা ম্যাডামকে সম্পি ভালো করে দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু ম্যাডাম ঘরে ঢুকে পড়ার আগে সম্পি একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে। ওঁর শরীরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ামাত্রই সেখান থেকে সাদা ধোঁয়া বেরিয়েছে। গরম লোহার শিক আচমকা জলে ডোবালে যেমনটা হয়।

তা হলে কি সত্যি-সত্যিই বৃষ্টির ফোঁটায় এই পিশাচগুলোর ছ্যাঁকা লাগে? সেইজন্যই কি সেই ভয়ংকর রাতে এদের মাথায় ছাতা ছিল?

সম্পি তখনও চিৎকার করছিল : 'কে কোথায় আছ, শিগগির এসো! দোতলায় আগুন লেগেছে—আগুন!'

কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটার ব্যাপারটা বুঝে ফেলার পর ওর হারানো সাহস খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এল। তা ছাড়া ও লোকজনের ছুটে আসার শব্দ পাচ্ছিল।

সম্পি আঁজলা করে বৃষ্টির জল ধরতে লাগল। এবং এগোতে লাগল টিচার্স রুমের দিকে। ওর ভেতরে এখন একটা রাগ টগবগ করে ফুটছিল।

রনিতা ইলেকট্রিকের তারে কামড় বসানোমাত্রই শর্ট সার্কিট হয়ে স্কুল বিল্ডিং-এর অনেকটা অংশের আলো নিভে গেছে। সেই সময় দুজন দারোয়ান রোজকার মতো একতলার ঘরগুলোর জানলা-দরজা বন্ধ করে

দরজায়-দরজায় তালা দিচ্ছিল। আচমকা অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় ওরা হকচকিয়ে যায়। আর তারপরই সম্পির চিৎকার ওদের কানে এল।'

সম্পির চিৎকার সার্ভেন্ট্‌স কোয়ার্টারেও পৌঁছেছিল। সেখান থেকে বলাইদা আর মলিনাদি হন্তদন্ত হয়ে এসে দারোয়ানদের সঙ্গে জড়ো হল। ওরা চারজন তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে শুরু করল। বুঝতে পারল, চিৎকারটা দোতলার চাতাল থেকে আসছে।

তা হলে কি দোতলাতেই আগুন লেগেছে?

কিন্তু ওরা চারজনে চাতালে এসে কাউকে দেখতে পেল না। আর আগুনও দেখতে পেল না।

কারণ, সম্পি তখন বৃষ্টির জল আঁজলা করে নিয়ে টিচার্স রুমে ঢুকে পড়েছে। ওর শরীর থরথর করে কাঁপছে। সারা গা সপসপে ভেজা। মাথার চুল থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। চুলের গোছা কপালের ওপরে নেমে এসেছে। আর সেই ভেজা চুলের ফাঁক দিয়ে ওর দুটো রাগী চোখ দেখা যাচ্ছে।

'কোথায় গেলি? আয়, সামনে আয়—' পিশাচকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল ডাকাবুকো মেয়েটা।

রনিতা তখন একটা আলমারির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লুকোতে চেষ্টা করছেন। ওঁর অন্ধকার গর্তের মতো চোখ দুটো সম্পির দিকে তাকিয়ে স্থির। আসলে ওরা তখন সম্পির আঙুলের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়া বৃষ্টির জলের দিকে লক্ষ রাখছিল। অপেক্ষা করছিল, কখন সেই চুঁইয়ে পড়া বন্ধ হবে। অর্থাৎ, মেয়েটার এক আঁজলা জল কখন শেষ হবে।

জল শেষ হয়ে যাবে বলে সমর্পিতার মনে কিন্তু ভয় ছিল না। ও জানে ওর পোশাক-আশাক থেকে শুরু করে সর্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে ভিজে সপসপে। এই অবস্থায় ওর পিশাচটাকে জড়িয়ে ধরার খুব সাধ জাগছিল।

সম্পি হঠাৎই খেয়াল করল, আলমারির পাশে দাঁড়ানো রনিতার চেহারা ধীরে-ধীরে বদলে যাচ্ছে—স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে আবার। একইসঙ্গে দোতলার চাতালে অনেকের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে—কথা বলতে-বলতে কারা যেন টিচার্স রুমের দিকে এগিয়ে আসছে।

সম্পির হাতের জল শেষ হয়ে গিয়েছিল। রনিতাকে ও এখন আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল।

রনিতা হিসহিস করে চাপা গলায় ব লেন, 'আজকে যা কিছু দেখলি কাউকে বলবি না। তা হলে তোর সর্বনাশ হবে। মনে রাখিস, আমি একা নই— আমরা সবাই মিলে তোকে অনায়াসে খতম করে দেব....।'

রনিতা ম্যাডাম স্বাভাবিক চেহারায় ফিরে এলেন। ঠোঁটে আঙুল তুলে ইশারায় সমর্পিতাকে চুপচাপ থাকতে বললেন।

'কই, কোথায় আগুন লেগেছে?' পুরুষের গলা ঃ 'ঘর অন্ধকার কেন?'

'কে অমন চিৎকার করছিল গো?' মহিলার কণ্ঠস্বর ঃ 'কী-করে আগুন লাগল বলো দেখি....।'

সমর্পিতা পিছন ফিরে চারজনকে দেখতে পেল। ওরা তখন বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে হুড়মুড় করে টিচার্স রুমে ঢুকে পড়েছে।

সমর্পিতা কিছু বলে ওঠার আগেই মানুষের ছদ্মবেশে থাকা পিশাচটা বলে উঠল, 'এই তো, এই তারটা শর্ট সার্কিট হয়ে আর-একটু হলেই আগুন লেগে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস আমি এই ডাস্টারটা দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে চেপে ধরেছি—।'

টেবিল থেকে একটা ডাস্টার তুলে নিয়ে দেখালেন রনিতা।

সম্পি স্থির চোখে ওঁকে দেখছিল। পিশাচরা তা হলে অভিনয়টা ভালোই জানে!

রনিতা বললেন, 'সমর্পিতা থাকায় একটা বড় হেল্‌প হয়েছে। ও সঙ্গে-সঙ্গে ওরকম না চেঁচালে তোমরা কি এত চটপট আসতে?' সমর্পিতার দিকে তাকিয়ে হাসলেন ঃ 'থ্যাংক য়ু, সমর্পিতা। তোমাকে আমি কাল একটা রিওয়ার্ড দেব....।'

ঠিক তখনই সাদা আলোর ঝলকানি, আর তারপরই কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল কোথাও।

॥ আট ॥

সমর্পিতা স্কুল বিল্ডিং-এর বাইরে এসে দাঁড়াল। বৃষ্টির তেজ খানিকটা কমে এসেছে। মেঘলা আকাশের সঙ্গে সন্ধের অন্ধকার মিশে গিয়ে ছাই রং অনেক গাঢ় হয়েছে।

সমর্পিতার ব্যাগে ছাতা আছে কিন্তু ও ছাতা বের করল না। একে তো ওর সর্বাঙ্গ চুপচুপে ভেজা—ছাতা ওকে নতুন কোনও নিরাপত্তা দিতে পারবে না। বরং বৃষ্টির জল ওকে রনিতা ম্যাডামের মতো ভয়ংকর প্রাণীগুলোর হাত থেকে বাঁচাবে।

সমর্পিতা বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিল, থরথর করে কাঁপছিল। ওর বুকের ভেতরে টিপটিপ করে শব্দ হচ্ছিল। তার সঙ্গে বেশ শীত করছিল।

ও কালো আকাশের দিকে তাকাল। বৃষ্টি উপহার দেওয়ার জন্য ঈশ্বরকে মনে-মনে কৃতজ্ঞতা জানাল।

স্কুল বিল্ডিং-এর কাছ থেকে পিচের রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে মেন গেটের দিকে। সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল সম্পি। হেঁটে যাওয়ার সময় ও বারবার বাঁ-দিকের ঝোপঝাড় আর গাছপালার দিকে তাকাচ্ছিল। এই গাছপালার আড়ালে রনিতা ম্যাডামের মতো কেউ লুকিয়ে নেই তো?

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই ওর মনে হল, যেরকম জোরে বৃষ্টি পড়ছে তাতে খোলা জায়গায় ওরা থাকতে সাহস পাবে না। বৃষ্টিতে গায়ে ফোসকা পড়ে যাবে। আর যদি সেদিনের মতো ছাতা মাথায় দিয়ে ঘোরাঘুরির কথা ভাবে তাতেও লাভ নেই। কারণ, এ-বৃষ্টি ছাতায় তেমন মানবে না।

সম্পি তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। স্কুল থেকে বেরিয়েই বাস কিংবা অটো পেলে হয়।

ভেজা পিচের রাস্তায় বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়ছে। রাস্তার ধারে লাগানো সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের আলো রাস্তায় পড়ে কমলা রঙের আলোর ফুলকি তৈরি করছে। স্কুলের দু-চারজন মেয়ে তাদের গার্জেনের সঙ্গে ফিরছে। এ ছাড়া রাস্তাটা বেশ ফাঁকা-ফাঁকা। আর দূরের খেলার মাঠটা বৃষ্টিতে ঝাপসা।

'এই, সম্পি—।'

সমর্পিতা চমকে উঠল। বুক ধড়াস করে উঠল। ডাক লক্ষ্য করে ফিরে তাকাল।

ও খেয়ালই করেনি, একটা বড় নিমগাছের নীচে দুটো মেয়ে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ইলিনা আর সজনী।

ওরা দুজনে সম্পির কাছে এগিয়ে এল।

'তোর জন্যে চিন্তা হচ্ছিল। তাই বাড়ি যাইনি—ওয়েট করছি।' ইলিনা বলল, 'রনিতা ম্যাডাম কী শাস্তি দেয় না দেয়। আমি ওয়েট করব শুনে সজনীও থেকে গেল।'

'তুই ভিজছিস কেন? ছাতা নেই?' সজনী জিগ্যেস করল।

'তুই এরকম কাঁপছিস কেন?' ইলিনা।

সমর্পিতা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ইলিনাকে জাপটে ধরে হাউ-হাউ করে কাঁদতে শুরু করল।

ইলিনা হকচকিয়ে গেল। কোনও-রকমে ছাতা সামলে সম্পির ভেজা পিঠে হাত বোলাতে লাগল আর বারবার বলতে লাগল, 'কী হয়েছে রে, সম্পি—কী হয়েছে?'

সম্পি কাঁদতেই থাকল। ওর শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। আর একইসঙ্গে ও পাগলের মতো মাথা নেড়ে বলতে লাগল, 'কিছু হয়নি, কিছু হয়নি।'

ইলিনা আর সজনী কিছুতেই ওকে শান্ত করতে পারছিল না।

একটু পরে দুপাশ থেকে সম্পিকে জাপটে ধরে ওরা মেন গেটের দিকে এগিয়ে চলল। ইলিনার মনে হল, রনিতা ম্যাডাম নিশ্চয়ই সম্পিকে সাংঘাতিক অপমান করেছেন, কিংবা চড়-থাপ্পড় মেরেছেন বা কান মুলে দিয়েছেন।

ওরা যখন স্কুলের গেটের কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন একটা গাড়ির হেডলাইটের জোরালো আলো ওদের চোখে-মুখে এসে পড়ল।

আলোর দিকে তাকিয়ে ওদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে ওরা স্পষ্ট দেখতে পেল। কিন্তু আলোর পিছনে সব অন্ধকার—কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

গাড়িটা ওদের দিকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

সেটা দেখে ইলিনারা পিচের রাস্তার পাশে ঘাসজমির দিকে সরে গেল। কিন্তু গাড়িটা গতিপথ বদলে ওদের মুখোমুখি এসে পথ আগলে দাঁড়াল।

ইলিনা একটু ভয় পেয়ে গেল। সজনীও। গাড়িটা ওদের পথ আগলে দাঁড়াল কেন?

ঠিক তখনই গাড়ি থেকে কে যেন ডেকে উঠল, 'ইলিনা, এসো—সবাই গাড়িতে উঠে এসো...।'

অনুষ্কার গলা।

অনুষ্কা এখনও বাড়ি যায়নি? ছুটির পর এতক্ষণ ধরে ও কী করছে?

ওরা তিনজনে গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল সামনের জানলার কাচটা সামান্য নামানো। সেখানে আবছাভাবে অনুষ্কার মুখ দেখা যাচ্ছে। ওর পাশেই স্টিয়ারিং-এ ওর বাবা।

'তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে এসো—।' অনুষ্কা তাড়া দিল। গাড়ির পিছনের দরজাটা খুলে গেল।

সম্পিকে গাড়িতে উঠতে বলল ইলিনা। তারপর ছাতা বন্ধ করে নিজে উঠল।

সজনী ইতস্তত করছিল। বলল, 'আমি বাড়ি যাব—।'

অনুষ্কা বলল, 'চিন্তা কোরো না— আমি সবাইকে বাড়িতে ড্রপ করে দেব।'

ওরা তিনজনে পিছনের সিটে বসে দরজা বন্ধ করতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

অনুষ্কা ওর বাবার সঙ্গে সম্পি আর সজনীর পরিচয় করিয়ে দিল। ওর বাবা গাড়িটা ইউ টার্ন নিয়ে ঘুরিয়ে বললেন, 'কী বাজে বৃষ্টি! তোমরা সব একেবারে ভিজে গেছ দেখছি!'

ইলিনা সৌজন্যের ঢঙে বলল, ‘ও কিছু না, কাকু—বাড়িতে গিয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে নেব।’

সমর্পিতার গা ঘেঁষে বসেছিল ইলিনা। তাই টের পাচ্ছিল সম্পি তখনও তিরতির করে কাঁপছে।

ও চাপা গলায়, প্রায় ফিসফিস করে, জিগ্যেস করল, ‘সম্পি, তোর কী হয়েছে রে? এবার শান্ত হ।’

সমর্পিতা অস্পষ্টভাবে বলল, ‘কিচ্ছু না—।’

অনুষ্কা ওদের কথা শুনতে পেয়েছিল। ও নরম সুরে বলল, ‘এখন ওকে ডিসটার্ব কোরো না। আমি সব জানি। পরে কখনও ওর সঙ্গে কথা বলব.....।’

সমর্পিতা অবাক হয়ে অনুষ্কার দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না।

ভিজে রাস্তায় গাড়ি চলতে লাগল।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল সম্পি। বৃষ্টি এখনও পড়ছে। সেই বৃষ্টির ফোঁটার ঝিলিমিলির আড়ালে রনিতা ম্যাডামের পালটে যাওয়া মুখটা ও দেখতে পাচ্ছিল।

আজ বৃষ্টি নেই। খোলা জানলার বাইরে অন্ধকার। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে।

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে অনুষ্কা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল। কী দেখছিল কে জানে!

হঠাৎ করে ও ঘুরে দাঁড়াল। বিছানায় বসে থাকা ইলিনার দিকে সরাসরি তাকাল।

বেশ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর গায়ের সবুজ রঙের টপটা কোমরের কাছ থেকে ইঞ্চিচারেক ওপরে তুলে ধরল ও।

ওর নাভির ঠিক ওপরে কালো রঙে আঁকা একটা ছবি : একটা ফুলকে ঘিরে আছে দুটো সাপ—তাদের লেজের কাছটা একে অপরের সঙ্গে জড়ানো।

ঠিক এই ছবিটাই লাগানো রয়েছে ওর ঘরের দেওয়ালে। এই ছবিটাই ওকে খাতার পাতায় আঁকতে দেখেছিল ইলিনা। তখন ওর ছবিটা ভালো



…টপটা কোমরের কাছ থেকে ইঞ্চি-চারেক ওপরে তুলে ধরল…

লেগেছিল। ও তা থেকে ট্যাটুর ডিজাইন করতে চেয়েছিল। কিন্তু অনুষ্কা তাতে সায় দেয়নি। বাজে ওয়ার্থলেস ছবি বলে কাটাকুটি দাগ দিয়ে ছবিটা নষ্ট করে দিয়েছিল।

অথচ সেই ছবিটাকেই বডি ট্যাটু করে বসে আছে ও!

'এই ছবিটাকে তুমি বাজে ওয়ার্থলেস বলেছিলে—' অভিযোগের সুরে বলে উঠল ইলিনা, 'আর সেই ছবিটাকেই ট্যাটু করে বসে আছ! আশ্চর্য!'

অনুষ্কা অল্প হাসল। টপটা তুলে ধরা অবস্থায় কয়েকটা পা ফেলে ইলিনার খুব কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'তুমি ভুল করছ, ইলিনা—এটা মোটেই ট্যাটু নয়। হাত দিয়ে দ্যাখো....।'

সত্যিই ইলিনা আঙুল ছোঁয়াল ছবিটায়। ছবিটা যে উল্কি নয় সেটা বুঝতে চাইল ঃ 'ট্যাটু নয় তো এটা তা হলে কী?'

'এটা জন্মদাগ। মানে, জন্মচিহ্ন। আমাদের সবার পেটে আছে।'

'জন্মচিহ্ন মানে?'

'জন্মচিহ্ন মানে জন্মের সময় থেকেই এই দাগটা আমাদের সবার পেটে থাকে....।'

'আমাদের সবার মানে কারা?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ইলিনা।

'আমি, বাপি, মা—আমাদের সবার পেটে এই ছবি আছে—জন্মদাগ।'

'কেন? এ কী পিকিউলিয়ার ব্যাপার!'

টপটা ছেড়ে দিল অনুষ্কা। ওটা টেনেটুনে ঠিকঠাক করে নিল। তারপর ইলিনার চিবুকে হাত দিয়ে বলল, 'পিকিউলিয়ার নয়, ইলিনা। ভ্যাম্পায়ার-দের এটাই নিয়ম....।'

'ভ্যাম্পায়ার?' ভয়ে সিঁটিয়ে গেল ইলিনা। অনুষ্কার হাতটা সরিয়ে দিল ঃ 'কী বলছ তুমি!'

'হ্যাঁ, ইলিনা—' নীচু গলায় বলল, 'ভ্যাম্পায়ারদের চেনার এটাই সবচেয়ে বড় চিহ্ন। তা ছাড়া এই সিম্বলটা আমাদের কাছে খুব পবিত্র....' দেওয়ালে লাগানো সাপ আর ফুলের ছবিটার দিকে দেখাল ঃ 'এটা আমাদের পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। তাই আমাদের দেখে সাধারণ মানুষ বলে মনে হয়...। অবশ্য এটা দেখতে পেলেও সবাই ট্যাটু ভাববে।'

ইলিনা কাঁপছিল। ওর চোখ বড়-বড় হয়ে গিয়েছিল। ও ভয়ের চোখে সহপাঠীকে দেখছিল।

অনুষ্কা ভ্যাম্পায়ার!

'ইলিনা, প্লিজ....ভয় পেয়ো না। মানুষের মতো....আমাদের মধ্যেও.... ভালো-খারাপ আছে। আমরা ভালো, ইলিনা, বিশ্বাস করো—।'

ইলিনার মাথা ঝিমঝিম করছিল। চোখে ঝাপসা দেখছিল। ও মাথা পিছনে হেলিয়ে বিছানায় দু-হাতে ভর দিল।

ওর চোখ গেল দেওয়ালে টাঙানো রাতের ছবিটার দিকে। জ্যোৎস্না ধোওয়া রাত। বিশাল প্রাসাদ। পূর্ণিমার চাঁদ।

আগের দিন ছবিটা যেমন দেখেছিল আজ যেন একটু বদলে গেছে। প্রাসাদের ছায়ার পাশ থেকে চাঁদটা যেন অনেকটা দূরে সরে গেছে। আর আগের দিন, যতদূর ইলিনার মনে পড়ছে, বাড়িটার একটা জানলায় আলো জ্বলছিল।

আজ আলো জ্বলছে দুটো জানলায়!

নিজেকে সামলে নিল ইলিনা। মাথা ঝিমঝিম করলে চলবে না। চোখে ঝাপসা দেখলে চলবে না।

ও তাকাল অনুষ্কার মুখের দিকে।

এই অপরূপ রূপসী মেয়েটা ভ্যাম্পায়ার!

আজ টিফিনের সময় অনুষ্কা ইলিনাকে ডেকেছিল।

ইলিনা ওর কাছে যেতেই ও বলেছে, 'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। ভীষণ ইমপরট্যান্ট কথা। তুমি আজ ছুটির পর আমাদের বাড়ি চলো—প্লিজ।'

অনুষ্কার মুখে আকুতির ভাব ফুটে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, এমন সব কথা ও ইলিনাকে বলতে চায় যেগুলো না বলতে পারলে ও কষ্ট পাবে।

ইলিনা রাজি হয়েছিল। একইসঙ্গে ওর মনে হয়েছিল, রনিতা ম্যাডামের সমস্যাটা যদি সমাধান করতে হয় তা হলে অনুষ্কার সাহায্য দরকার। কারণ, সমর্পিতার ব্যাপারটা যে ইলিনা জানতে পেরেছে সেটা শুধু অনুষ্কার জন্য।

ওই ঘটনার পর সমর্পিতা এক সপ্তাহ স্কুলে আসেনি। ওর বাড়িতে ফোন করে ইলিনা জেনেছে, পরদিন ভোরবেলা থেকে সম্পির খুব জ্বর। সেই জ্বর এতটাই খামখেয়ালিভাবে ওঠানামা করছিল যে, সম্পির মা-বাবা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া সম্পি জ্বরের মধ্যে ভুল

বকছিল। সবকিছু মিলিয়ে ওর মা-বাবা ভাবছিলেন ব্যাপারটা ভাইরাল ফিভার নয়—অন্য কিছু।

ইলিনা, সজনী আর অনুষ্কা একদিন স্কুলের পর সম্পিকে দেখতে গিয়েছিল। তখন ও অনেকটা সামলে উঠেছে।

ইলিনা আর সজনী ওকে সেদিন টিচার্স রুমের ব্যাপার নিয়ে অনেক প্রশ্ন করল, কিন্তু সম্পি গোঁজ হয়ে বসে রইল। ঠিকঠাক কোনও জবাব দিল না।

ওর মা নানান কথা বলছিলেন।

'দ্যাখো না, যে-মেয়ে সবসময় সাহসের বড়াই করে সে কেমন ভয়ে চুপসে গেছে। এই তো, গত পরশু—যখন জ্বরটা খুব বেড়েছিল—তখন জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছিল। বারবার বলছিল, "বৃষ্টির জল। বৃষ্টির জল দিয়েই খতম করতে হবে......বৃষ্টির জল চাই.....বৃষ্টি চাই।"

'আমি ওকে মাথায় জলপটি দিয়ে, ধাক্কা দিয়ে সাড় ফেরাতেই কেমন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। অনেকবার জিগ্যেস করলাম, "বৃষ্টির জল দিয়ে কী করবি বলছিলি?" তো ও হাঁ করে তাকিয়ে রইল—কোনও জবাব দিল না। বলো দেখি, কী মুশকিল!

'তা ছাড়া ক'দিন ধরে খাবারদাবার কিছু মুখে তুলছে না। শুধু বলছে খিদে নেই। তোমরা ওকে একটু বুঝিয়ে বলো তো। ঠিকঠাক না খেলে শরীরে জোর পাবে কেমন করে?'

সম্পির মা একটানা কথা বলে যাচ্ছিলেন। আর অনুষ্কা শান্ত চোখে সম্পির দিকে তাকিয়ে ওকে দেখছিল।

'ও, হ্যাঁ। তোমাদের একজন দিদিমণি বাড়িতে ফোন করেছিলেন। সম্পি কেমন আছে সে-খবর নিচ্ছিলেন। বললেন, সম্পি ওঁর খুব প্রিয় স্টুডেন্ট....।' মেয়ের দিকে ঘুরে তাকালেন : 'অ্যাই, কী নাম যেন ওই দিদিমণির? তোকে যে সেদিন বললাম....।'

সম্পি নিষ্প্রাণ স্বরে বলল, 'রনিতা ম্যাডাম।'

ইলিনা আর সজনী মুখচাওয়াচাওয়ি করল। কিন্তু কোনও কথা বলল না।

একটু পরে সম্পির মা ঘর ছেড়ে চলে যেতেই অনুষ্কা বলল, 'সম্পি, রনিতা ম্যাডাম তোমাকে থ্রেট করেছেন?'

সম্পি চুপ করে রইল। বিছানার চাদরের দিকে তাকিয়ে রইল। আঙুল খুঁটতে লাগল।

'আমি সব জানি, সম্পি। রনিতা ম্যাডাম এখন আর মানুষ নেই—অন্য কিছু হয়ে গেছেন। পরানের মার্ডারে রনিতা ম্যাডাম ইনভল্‌ভ্‌ড্‌....।'

সমর্পিতা চমকে মুখ তুলে তাকাল। ইলিনা আর সজনীও তাকাল অনুষ্কার দিকে।

'তুমি কেমন করে জানলে?' সম্পি অস্পষ্ট গলায় জিগ্যেস করল।

'আমি জানি—' আত্মবিশ্বাসের জোর ফুটে বেরোল অনুষ্কার উত্তরে: 'সেদিন ঠিক কী হয়েছিল আমাকে খুলে বলো।' অনুষ্কা সম্পির কাঁধে একটা হাত রাখল: 'কোনও ভয় নেই। আমরা তোমাকে হেল্‌প্‌ করতে চাই....।'

তিনজনে মিলে আরও খানিকক্ষণ বোঝাতেই সম্পি নরম হল। ও দুর্বল গলায় ধীরে-ধীরে সেদিনকার সব ঘটনা খুলে বলল।

শুনতে-শুনতে ইলিনা আর সজনীর ভেতরে ভয়ের হিমেল স্রোত ছড়িয়ে পড়ল। এসব কী বলছে সম্পি!

ওর কাহিনি শুনতে-শুনতে অনুষ্কা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। ওর ফরসা গালে গোলাপি আভা ছড়িয়ে পড়ল।

একসময় ওরা তিনজন উঠে পড়ল। বাড়ি ফিরতে হবে। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে।

ক'দিন ধরেই রোজ ভালো বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তায় জল জমে যাচ্ছে।

আজ সম্পির বাড়ি আসার ব্যাপারে অনুষ্কা একটু কিন্তু-কিন্তু করেছিল। বলেছিল, যদি সম্পির বাড়ির রাস্তায় জল জমে যায় তা হলে কিছুতেই ও গাড়ি থেকে নামতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত সেরকম বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুষ্কা রেনকোট এবং ছাতা দুটোই নিয়ে বেরিয়েছে। এ নিয়ে ইলিনা আর সজনী ওকে ঠাট্টা করতে ছাড়েনি। কিন্তু অনুষ্কা সেই পুরোনো কথাই বলেছে: বৃষ্টি ওর ভালো লাগে না।

সম্পির বাড়ি থেকে ফেরার পর তিনটে দিন অনুষ্কা কীরকম যেন আনমনা ছিল। তারপর আজ ইলিনাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসেছে।

ইলিনা অন্ধকার প্রাসাদের ছবিটার দিকে তাকিয়ে ছিল। না, ও মোটেই

ভুল দেখছে না। আজ সত্যি-সত্যিই দুটো জানলায় আলো জ্বলছে!

'এই ছবিটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও মিস্ট্রি আছে।' প্রাসাদের ছবিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইলিনা বলল, 'আজ দেখছি দুটো জানলায় আলো জ্বলছে! আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রথম যেদিন তোমার বাড়িতে এসেছিলাম সেদিন....।'

ওকে থামিয়ে দিয়ে অনুষ্কা বলল, 'বাড়িটার একটা জানলায় আলো জ্বলছিল।' তারপর ইলিনার পাশে বসে পড়ল : 'সেদিন তোমাকে বলিনি—আজ বলছি। এই বাড়িটা আমাদের পূর্বপুরুষের—তিনহাজার বছরের পুরোনো। আমাদের মতন যারা...মানে, ইয়ে....তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে এই ছবিটা লাগানো আছে। এই ছবিটার একটা সুপারন্যাচারাল পাওয়ার আছে। ওটা নিজে-নিজে অনেক কিছু করতে পারে—।'

কথা বলতে-বলতে অনুষ্কা লক্ষ করল ইলিনার মুখে ভয়ের রেখা ফুটে উঠেছে। ও বিছানায় ঘষটে অনুষ্কার কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে চাইছে।

অনুষ্কা ওর হাত চেপে ধরল। অনুনয়ের গলায় বলল, 'ইলিনা, প্লিজ... বিলিভ্ মি। আমি তোমার বন্ধু—বেস্ট ফ্রেন্ড। এটা ঠিকই যে, আমাদের লাইফ আর লাইফ স্টাইল তোমাদের চেয়ে আলাদা। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমরা কখনও মানুষের ক্ষতি করার কথা ভাবতে পারি না। তুমি কি বিশ্বাস করবে, আমরা প্রায় চারশো বছর ধরে মানুষের রক্তের তেষ্টা ভুলে গেছি! তার বদলে আমরা ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, চড়ুই, পায়রা এসব দিয়ে খিদে-তেষ্টা মেটাই! আমার বাপি আর মা কী বলেন জানো? বলেন, আমাদের অবজেক্টিভ হল রেগুলার চেষ্টা করে-করে ফাইনালি ভেজিটারিয়ান হয়ে ওঠা। হ্যাঁ, এটাই আমাদের চরম মুক্তি।'

অনুষ্কার মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। বড়-বড় শ্বাস নিয়ে ও বলল, 'আমাদের প্রবলেম একটাই : আমরা সেদ্ধ, ভাজা, পোড়ানো—মানে, রান্না করা খাবার একদম খেতে পারি না। আমাদের সিস্টেম নেয় না। তাই আমরা সবকিছু কাঁচা খাই।

'কিন্তু তা বলে আমরা হাল ছাড়িনি। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি। মানুষের বন্ধু হতে চেষ্টা করছি। মানুষের মতো হতে চাইছি। বিশ্বাস করো, প্লিজ...।'

অনুষ্কার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। যেন হিরের কুচি ওর ফরসা গালের ওপরে চিকচিক করছিল।

ওর দুঃখী মুখের দিকে তাকিয়ে ইলিনার মনে হল, এ চোখের জল মিথ্যে হতে পারে না। এর মধ্যে কোথায় যেন সত্যের ঝিলিক আছে।

মুহূর্তের মধ্যে ইলিনার মনে এক আশ্চর্য আবেগ তৈরি হয়ে গেল। ও সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনুষ্কাকে জাপটে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে ওর চোখেও জল এসে গেল। কান্না জড়ানো গলায় ও বারবার বলতে লাগল, 'তুমি আমার বন্ধু, অনুষ্কা। তুমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড....বেস্ট ফ্রেন্ড....।'

॥ নয় ॥

সমর্পিতা যখন স্কুলে আবার এল তখন ওর জ্বর সেরে গেছে, কিন্তু শরীর খুব দুর্বল। আগের চেয়ে অনেক রোগা দেখাচ্ছে ওকে। পিঠের স্কুল-ব্যাগটা প্রকাণ্ড আর বেঢপ মনে হচ্ছে।

সমর্পিতা এখন অনুষ্কার পাশে বসে। ফাঁক পেলেই ওর সঙ্গে গল্প করে। আর রনিতা ম্যাডামের ভয়ের কথা আলোচনা করে।

অনুষ্কার অন্যপাশে বসে ইলিনা। অনুষ্কার পাশে বসতে ওর ভালো লাগে তাই।

অনুষ্কার সঙ্গে আলাপ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই সমর্পিতা বুঝতে পেরেছে, অনুষ্কার বুদ্ধি অনেক তীক্ষ্ণ এবং গভীর।

অনুষ্কার পরামর্শেই এখন ইলিনা, সজনী আর সমর্পিতা মোবাইল ফোন সঙ্গে নিয়ে স্কুলে আসে। সেটা হয় সাইলেন্ট মোডে রাখে অথবা অফ করে রাখে। কারণ দিদিমণিরা টের পেলেই শাস্তি পেতে হবে।

সেদিন অনুষ্কার বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর ইলিনা রাতে ঘুমোতে পারেনি। অন্ধকারে জেগে থেকে শুধু ওই অদ্ভুত মেয়েটার কথা ভেবেছে।

ভ্যাম্পায়ারের গল্প ইলিনা বইয়ে পড়েছে, দু-একটা সিনেমাতেও দেখেছে। কিন্তু বাস্তবে ভ্যাম্পায়ার হয় বলে কখনও ভাবেনি। তা ছাড়া ভ্যাম্পায়াররাও যে খারাপ এবং ভালো দুরকমের হতে পারে সেটাও কখনও ভেবে দেখেনি।

অনুষ্কা ওকে বলেছে, 'আমরা কখনও কারও ক্ষতি করি না। আমাদের ধর্মে অকারণে শক্তি ব্যবহার করা বারণ। আমাদের অনেকরকম সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার আছে। কিন্তু সেগুলো খুব জরুরি সিচুয়েশান না হলে আমরা ইউজ করি না। আমরা সবসময় চুপচাপ থাকি, কারও ব্যাপারে নাক গলাই না। কারণ, আমরা...আমরা নিজেদের আসল পরিচয় গোপন

রাখতে চাই।'

অনুষ্কার গোপন কথা ইলিনা কাউকে বলেনি। এমনকী মা-বাবাকেও নয়।

স্কুলে অনুষ্কার পাশে রোজ বসতে পেরে ইলিনার নিজেকে অনেক বেশি সাহসী, শক্তিশালী আর বুদ্ধিমতী মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, রনিতা ম্যাডাম— কিংবা ওইরকম কোনও পিশাচ—ওর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

ইলিনা পরানের কথা ভাবছিল।

পরান মারা যাওয়ার পর যে-ঢেউ উঠেছিল সপ্তাহদুয়েকের মধ্যে সেটা থিতিয়ে গেল। রাজা চন্দ্রভানু মালটিপারপাস গার্লস স্কুল আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এল। এবং স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশানের রিহার্সাল আবার শুরু হয়ে গেল। হেডমিসট্রেস প্রীতি দত্ত নোটিশ জারি করে সে-কথা সব ক্লাসে জানিয়ে দিলেন।

সমর্পিতা মাঝে-মাঝে রনিতা ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করে। বন্ধুদের বলে ইতিহাস পড়া বুঝতে যাচ্ছে। আসলে ও এ-কথাই বলতে যায় যে, ও সেদিনকার কথা কাউকে বলেনি।

রনিতা ম্যাডামকে দেখে ও অবাক হয়ে যায়। এত স্বাভাবিক, এত স্নেহ-মাখানো ব্যবহার! সেদিন কর্কশ-স্বরে-কথা-বলা ভয়ংকর চেহারার যে-পিশাচকে সমর্পিতা দেখেছিল সেটা মনে হয় যেন সত্যি-সত্যি দেখার ভুল, হ্যালুসিনেশান।

রনিতা ম্যাডামের ওপর নজরদারির কাজটা ইলিনা, সজনী আর সমর্পিতা—তিনজনে মিলে করতে লাগল। ওরা চোখ-কান খোলা রেখে খুব সাবধানে পা ফেলতে লাগল। আর অনুষ্কাকে সব খবর জানাতে লাগল।

স্কুলের পিছনদিকে বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে অনেক বড়-বড় গাছ আছে। সেখানে গাছের ফাঁকে-ফাঁকে অনেক পুরোনো টিন, অ্যাসবেস্টস শিট, ভাঙা কাঠ, আর শ্যাওলা ধরা কয়েকশো ইট ডাঁই করে রাখা আছে।

একদিন টিফিনের সময় বাইরের মাঠে অনুষ্কা আর ইলিনা গল্প করছিল। হঠাৎ কোকিলের মিষ্টি ডাক শোনা গেল।

স্কুলের বাগানে সবসময়েই কোকিলের ডাক শোনা যায়। শুনে মনে হয় কোকিলরা শুধু বসন্তকাল নয়, বর্ষাকালেরও ইজারা নিয়ে নিয়েছে। ইলিনার খুব ইচ্ছে যে, ও 'ডাকন্ত' কোকিল দেখবে। ওর চোখ প্রায়ই সেই দৃশ্যটা খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সেই 'দুর্লভ' দৃশ্যটা ও আজও খুঁজে পায়নি।

তাই টিফিনের সময় কোকিলের ডাক শুনেই ইলিনা একেবারে লাফিয়ে উঠল। ও অনুষ্কার হাত ধরে টানতে-টানতে ডাকের উৎস লক্ষ করে ছুট লাগাল।

আন্দাজে ভর করে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে শেষ পর্যন্ত ওরা চলে এল স্কুলের পিছনের বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে। গাছপালার অঞ্চলে ঢুকে ওপরদিকে মুখ তুলে গাছের ডালপালা আর পাতার ফাঁকে কোকিলটা খুঁজতে লাগল।

অনুষ্কাই প্রথম দেখতে পেল পাখিটাকে। কুচকুচে কালো রং। একটা লম্বা গাছের ওপরদিকে একটা ডালের একেবারে গোড়ায় বসে আছে পাখিটা। 'কু-উ, কু-উ' করে ডাকছে।

ইলিনা কোকিলটাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, 'আমার বহুদিনের একটা ইচ্ছে আজ ফুলফিল্‌ড্‌ হল—।'

একটু পরেই পাখিটা উড়ে চলে গেল অন্যান্য গাছের আড়ালে।

ওরা যখন ফিরে আসছে তখনই ইলিনার চোখে পড়ল, ইট-কাঠের স্তূপের পাশে দুটো লোমশ প্রাণী পড়ে আছে।

দেখে চেনা গেল। একটা কাঠবিড়ালি, আর একটা বেজি। দুটো প্রাণী যেন পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে।

ওরা চট করে সেগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ে কাঠবিড়ালির দেহটা হাতে তুলে নিল অনুষ্কা।

হালকা। ফাঁপা। বোঝাই যাচ্ছে, ভেতরে সারবস্তু কিছু নেই। গলার কাছটায় রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

ইলিনা বেজির দেহটা একবার তুলেই ফেলে দিল। সেটাও চরিত্রে কাঠ-বিড়ালিটার মতো।

অনুষ্কা বলল, 'বুঝতে পারছ, ডেডবডিগুলো অন্যরকম?'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি—পরানের মতন।'

'এগুলো বেশি পুরোনো নয়। গন্ধ থেকে বুঝতে পারছি....' কাঠবিড়ালিটা ফেলে দিল ঃ 'কিছু একটা করা দরকার....।'

ইলিনা ঘড়ি দেখল। এখুনি টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়বে। রবিনা ম্যাডামের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। তাই ওরা স্কুল বিল্ডিং-এর দিকে প্রায় ছুট লাগাল।

ওদের এই কয়েকদিনের গোয়েন্দা-গিরিতে একটা ব্যাপার ওরা লক্ষ করেছে। ক্লাস নাইনের 'এ' সেকশানের একজন ছাত্রী আর ক্লাস টেন 'সি' সেকশানের একজন ছাত্রী প্রায়ই রনিতা ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে যায়।

ইলিনা, সজনী, সমর্পিতা আর অনুষ্কা ওরা যে যখন যা জানতে পারে সেটা এস-এম-এস করে বা ফোন করে বাকিদের জানিয়ে দেয়।

পরানের মৃত্যুর ঘটনার পর স্কুলের সার্ভেন্ট্স কোয়ার্টারের সামনে অনেকগুলো বাড়তি আলো লাগানো হয়েছে। স্কুল ক্যাম্পাসের রাস্তায় যেসব ল্যাম্পপোস্টের আলো খারাপ ছিল সেগুলো পালটানো হয়েছে। এ ছাড়া বড়দি উদ্যোগ নিয়ে জঙ্গলের কিনারায়, বাস্কেটবল গ্রাউন্ড আর ফেস্টিভ্যাল হলের চারপাশে অনেকগুলো নতুন আলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

এই চেষ্টা দেখে রনিতা ম্যাডাম একদিন ব্যঙ্গ করে সম্পিকে বলেছেন, 'আলো দিয়ে ভূত তাড়ানোর কনসেপ্ট বহুকাল হল বাতিল হয়ে গেছে। আলোয় আমাদের কোনও প্রবলেম নেই।' হাসলেন ম্যাডাম। তারপর ঃ 'যখন আমাদের তেষ্টা পায় তখন কীসের আলো আর কীসের অন্ধকার! তুই-ই বল্...।'

সম্পি কোনও জবাব না দিয়ে চলে এসেছিল। তারপর স্কুল ছুটির সময় বাকি তিনজন বন্ধুকে খবরটা জানিয়েছিল। তারপর বলেছিল, 'ওর কথার টোনে আমার মনে হয়েছে খুব শিগগিরই ওরা আর-একটা বড় কুকীর্তি করতে চলেছে....।'

ইলিনা ঠোঁট কামড়ে বলল, 'রিহার্সাল আবার শুরু হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, ওই পিশাচটা যতই বলুক, রাতের আলোতেই ওদের অ্যাক্টিভিটি বেশি....।'

এই দুশ্চিন্তাটা ইলিনার সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল। চিন্তায়-চিন্তায়

বহুক্ষণ একা-একা ছটফট করার পর ও অনুষ্কাকে ফোন করেছে।

অনুষ্কা ফোন ধরতেই ইলিনা বলেছে, 'শোনো, তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করব—।'

'বলো।'

'কাল থেকে অ্যানুয়াল ফাংশানের রিহার্সাল আবার শুরু হচ্ছে। তুমি কাল থেকে রিহার্সালে চলো...।'

অনুষ্কা ইতস্তত করল : 'কী করে যাই বলো তো! একে তো কোনও প্রোগ্রামে আমি নাম দিইনি, তার ওপর আমি—মানে, আমরা—মানুষদের এড়িয়ে চলি। নইলে ধরা পড়ে যেতে হয়। যেমন তোমার কাছে ধরা পড়ে গেলাম।'

'কিন্তু তুমি যদি হেল্প না করো তা হলে কেমন করে হয়! তুমিই তো বলেছ, তুমি সব জানো। তুমি ভরসা দিয়ে বলেছ "আমি তো আছি!" ফাংশানের রিহার্সাল রোজ সাতটা-সাড়ে সাতটা পর্যন্ত চলবে। যদি কারও কোনও বিপদ হয়! যদি সম্পির আবার কোনও বিপদ হয়! ও তো রনিতা ম্যাডামের টার্গেট হয়ে আছে....।'

অনুষ্কা চুপ করে ভাবছিল।

ইলিনা আবার বলল, 'ওসব জানি না, তুমি কাল রিহার্সালে যাবে। আর কিছু না পারো অন্তত একটা আবৃত্তি করবে। রবিনা ম্যাডামকে বলবে। তুমি রিহার্সালে থাকলে আমরা সবাই ভরসা পাব...।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অনুষ্কা বলেছে, 'ঠিক আছে—কাল থেকে আমি রিহার্সালে যাব।'

আনন্দে ফুলঝুরি হয়ে গেল ইলিনা। বলল, 'থ্যাংক য়ু, মাই বেস্ট ফ্রেন্ড।'

পরদিন অনুষ্কাকে রিহার্সালে দেখে অনেকেই অবাক হল। এই মুখচোরা ইনট্রোভার্ট মেয়েটা অ্যানুয়াল ফাংশানে পার্টিসিপেট করবে! কিন্তু ওকে কেউ অপছন্দ করতে পারল না।

ইলিনা জানে, অনুষ্কার মধ্যে এমন অনেক নাম-না-জানা গুণ আছে যার জন্য ওকে কেউ অপছন্দ করতে পারে না।



...সেটা তখন সম্পিকে জাপটে ধরে দাঁতের পাটি ফাঁক করেছে...

অনেকদিন পর ফেস্টিভ্যাল হলটা জমজমাট হয়ে ওঠায় ইলিনাদের খুব ভালো লাগছিল। ওরা সবাই মিলে কলকল করে এমন গল্পে মেতে উঠল যে, ওদের চুপ করানোর জন্য শম্পা ম্যাডাম, রবিনা ম্যাডাম, কাকলি ম্যাডামকে বেশ কয়েকবার বকুনি দিতে হল। তাতে গুঞ্জনের আওয়াজ কমল বটে কিন্তু থামল না।

রিহার্সালের তদারকিতে সমর্পিতা, অঙ্গনা, সজনী, রবিনা ম্যাডাম সবাই এদিক-ওদিক ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করছিলেন। কাকলি ম্যাডাম হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান তোলানো শুরু করে দিয়েছেন। শম্পা ম্যাডাম ক্লাস টেনের মধুরিমা আর শ্রাবন্তীকে নাচের একটা মুদ্রা বোঝাচ্ছেন।

সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল, কিছু একটা হচ্ছে বটে!

একটা অশুভ ঘটনার পর রিহার্সাল আবার শুরু হচ্ছে। তাই বড়দি বলেছেন তিনি রিহার্সালে আজ আসবেন—তা হলে সবাই উৎসাহ পাবে। তা ছাড়া আগে রিহার্সালে শুধু চা-বিস্কুট খাওয়ানো হত—আজ থেকে বড়দি টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। বলেছেন, রিহার্সাল অনেকদিন বন্ধ থাকায় হাতে সময় অনেক কমে গেছে। তাই রোজ একটু বেশিক্ষণ ধরে রিহার্সাল করতে হবে আর সেইজন্যই 'স্পেশাল' টিফিন।

রিহার্সাল পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। প্রীতি দত্ত এখনও আসেননি। অফিসে কী যেন কাজ করছেন—সেটা সেরেই আসবেন। বড়দি যেহেতু রিহার্সালে কখনও আসেন না তাই ওঁর আসাটা একটা বড় ঘটনা।

ইলিনারা বলাবলি করতে লাগল যে, এবার হয়তো রাশভারী বড়দিকে একটু-আধটু হাসতে দেখা যাবে। এ নিয়ে সজনী আর সমর্পিতা বাজিও ধরে ফেলল।

আজকের সন্ধেটা খুব সুন্দর। কোনও বৃষ্টি নেই। সূর্য ডোবার পর হালকা ছাই রঙের আকাশ। তার ওপরে গাঢ় স্লেট রঙের লম্বা-লম্বা আঁচড়। বাতাসে গাছপালার পাতা নড়ছে।

রিহার্সাল দিতে-দিতে বাইরেটা কখন যেন আঁধার হয়ে গেল।

ইলিনা অনুষ্কার সঙ্গে গল্প করছিল। গত বছরের অ্যানুয়াল ফাংশানের কথা বলছিল। কে আবৃত্তি করতে গিয়ে কবিতার লাইন ভুলে গেছে, কে গানে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে, কাকলি ম্যাডামের গলা কী মিষ্টি—এই সব গল্প করছিল।

এর মধ্যে আশাদিকে সঙ্গে করে প্রীতি দত্ত চলে এলেন। তিনি এসে পড়ায় অনেকেই তটস্থ হল, আবার খুশিও হল। তারপর টিফিনের প্যাকেট আর চা সবাইকে বিলি করা হল। সকলেই আনন্দ আর ফুর্তির মেজাজে টগবগ করছিল।

ইলিনার বেশ ভালো লাগছিল। অনুষ্কাও জমজমাট ব্যাপারটা এনজয় করছিল। ও কখনও ভাবেনি এত মানুষের মাঝে ও এরকম অস্বস্তিহীনভাবে বসে থাকতে পারবে।

ইলিনা লক্ষ করল, সম্পি ওর ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে ফেস্টিভ্যাল হলের জানলার কাছে চলে যাচ্ছে। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দেখছে। হয়তো সেই বিপজ্জনক সন্ধেটার কথা ও কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

হলের টিনের চালে থেকে-থেকেই খড়মড় আওয়াজ হচ্ছিল। ইলিনা জানে, ওগুলো গাছের শুকনো পাতা আর সরু ডালপালার শব্দ। হল ঘিরে যেসব বড়-বড় গাছ দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো থেকে প্রায়ই ডাল-পাতা খসে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই আওয়াজগুলো ইলিনাকে অল্প-অল্প ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল।

প্রথমদিন বলে বড়দি সাতটা নাগাদ রিহার্সাল শেষ করে দিতে বললেন। ভয় এড়াতে সবাই দলবেঁধে হল থেকে বেরিয়ে মেন গেটের পথ ধরল।

ইলিনার সঙ্গে পিচের রাস্তা ধরে এগোতে-এগোতে অনুষ্কা বলল, 'মনে হয়, ভয় কেটে গেছে। ওই পিশাচরা ঘুমিয়ে পড়েছে....।'

'কী করে বুঝলে?' ইলিনা অবাক হয়ে তাকাল বেস্ট ফ্রেন্ড-এর দিকে।

অনুষ্কা বলল, 'ওদের কেউ হয়তো আমাকে ফেস্টিভ্যাল হলে চিনে ফেলেছে। ওরা জানে, আমাদের মতো ভ্যাম্পায়াররা কখনও মানুষের প্রবলেমে ইনভল্‌ভ্‌ড হয় না। কিন্তু আমাকে দেখে নিশ্চয়ই ওদের কেউ একজন বুঝেছে আমি তোমাদের প্রবলেমে জড়িয়ে পড়েছি—তোমাদের পাশে দাঁড়িয়েছি....।'

'তোমাকে ওরা এত ভয় পায়!' অবাক হয়ে বলল ইলিনা।

অনুষ্কা হাসল : 'খারাপ ভ্যাম্পায়াররা ভালোদের সবসময় ভয় পায়। ওরা আমাদের ক্ষমতার কথা জানে। তবে এটাও জানে, আমরা সবসময় নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চাই।'

'ওরা নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চায় না?'

'চায়—কিন্তু পারে না। রক্তের তেষ্টা ওদের পাগল করে দেয়। মানুষের গন্ধ ওদের মাথা খারাপ করে দেয়। তা ছাড়া পূর্ণিমার সময় ওদের এই পাগলামিটা মারাত্মক বেড়ে ওঠে। তখন ওরা পশু কিংবা মানুষ মেরে তেষ্টা মিটিয়ে উল্লাসে নেচে বেড়ায়—কোনও জ্ঞান থাকে না।'

'যেদিন রাতে আমি ওরকম তিনটে পিশাচকে গাছে নাচানাচি করতে দেখেছিলাম সেদিন কি তা হলে পূর্ণিমা ছিল?'

'বোধহয় ছিল। সেদিন মেঘ-বৃষ্টি ছিল—তাই হয়তো বুঝতে পারোনি।'

ইলিনা কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করল। তারপর ভয়ে-ভয়ে আকাশের দিকে তাকাল।

দূরে খেলার মাঠের কিনারায় শুকনো মরা গাছটা দাঁড়িয়ে আছে। তার ডালপালার আড়ালে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। প্রায় গোল হয়ে এসেছে। কয়েকদিন পরেই শুক্লপক্ষের শেষ—তারপর পূর্ণিমা।

চাঁদটা অনুষ্কাকে দেখাল ইলিনা ঃ 'ওই দ্যাখো—ক'দিন পরেই পূর্ণিমা।'

'কী করে বুঝলে?' চাঁদের দিকে তাকিয়ে অনুষ্কা জানতে চাইল।

'খুব সোজা।' ইলিনা বলল, 'চাঁদের ওপরদিকটা যদি ডানদিকে হেলে থাকে, তা হলে শুক্লপক্ষ চলছে। আর যদি বাঁ-দিকে হেলে থাকে তা হলে কৃষ্ণপক্ষ। চাঁদের নীচের দিকের বাঁকটা সেই অনুযায়ী কৃষ্ণপক্ষের 'ঋ'-ফলা আর শুক্লপক্ষের হ্রস্ব 'উ'-কারের বাঁকের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। এটা আমাকে মা শিখিয়ে দিয়েছে—।' ইলিনা হাসল। কিন্তু তারপরই আসন্ন পূর্ণিমার কথা ভেবে ভয়ের গলায় বলল, 'পূর্ণিমার সময় ওরা কিছু করতে পারে....।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনুষ্কা বলল, 'শুধু পূর্ণিমা কেন? ভয় তো এমনিতেই আছে, কিন্তু পূর্ণিমার সময় ভয়টা আরও বেশি—।'

হঠাৎই একটা ব্যাপার মনে পড়ে যাওয়ায় ইলিনা জিগ্যেস করল, 'তুমি যে বললে তোমাকে ওরা চিনে ফেলেছে—কী করে চিনতে পারল?'

অনুষ্কা আলতো গলায় বলল, 'আজ রিহার্সালে আমি টিফিন খাইনি—চা-ও খাইনি। সেটা হয়তো ওদের কেউ লক্ষ করেছে। তা ছাড়া আমাদের দেখতে খুউব সুন্দর হয়। আর আমাদের গা থেকে একটা গন্ধ বেরোয়

অনেকটা দারচিনির গন্ধের মতো...।'

চেনার চিহ্নগুলো মনে-মনে খতিয়ে দেখল ইলিনা। তারপর গন্ধটার কথা ওর মনে পড়ল। ও অনুষ্কার গাড়িতে আর বাড়িতে এইরকম গন্ধ পেয়েছিল। কিন্তু গা থেকে ওরকম গন্ধ বেরোলে তো এখনও সেই গন্ধ ইলিনার নাকে আসার কথা!

ওর মনের কথা কী করে যেন টের পেয়ে গেল অনুষ্কা। বলল, 'ইলিনা, তোমার সঙ্গে আমার একটা মেন্টাল ম্যাচিং হয়ে গেছে। অনেকটা যেন রেডিয়ো স্টেশান ধরার টিউনিং-এর মতো। তাই তুমি হয়তো দু-একবার আচমকা ওই স্মেলটা পেয়ে গেছ। আসলে ওই গন্ধটা কুকুরের নাকে ধরা পড়ে—আর ওই পিশাচদের নাকেও। কুকুর প্রায় ন'হাজার রকম গন্ধ চিনতে পারে, মনে রাখতে পারে। আমরা প্রায় পাঁচশো রকম গন্ধ চিনতে পারি। রনিতা ম্যাডামের মতো পিশাচরাও তাই। তবে...।'

'আর আমরা? আমরা কতরকম গন্ধ চিনতে পারি?'

হাসল অনুষ্কা ঃ 'কিছু মনে কোরো না। তোমাদের বেলায় সংখ্যাটা মাত্র সত্তর থেকে আশি। আর তার মধ্যে এই দারচিনির মতো গন্ধটা পড়ে না। যেমন, তুমি এখন এই গন্ধটা পাচ্ছ না, তাই না?'

বিহ্বলভাবে মাথা নেড়ে সায় দিল ইলিনা। সত্যিই ওই গন্ধটা ও এখন পাচ্ছে না। ওই দুবার ছাড়া কখনও পায়নি।

হঠাৎই অনুষ্কার জন্য ভয় পেল ইলিনা। যদি ওই পিশাচগুলো অনুষ্কার কোনও ক্ষতি করে?

সে-কথাই জিগ্যেস করল ওকে।

অনুষ্কা ছোট্ট করে হেসে বলল, 'ভয় পেয়ো না। সেটা কিছুতেই পারবে না।'

ওরা গাড়ির কাছে এসে গিয়েছিল। অনুষ্কা ইলিনাকে ওর বাড়িতে নামিয়ে দেবে এরকমই কথা হয়েছিল। তাই দুজনেই উঠে বসল গাড়িতে।

অনুষ্কার বাবা গাড়ি স্টার্ট দিলেন। হেডলাইট জ্বেলে গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে যেতে-যেতে বললেন, 'কী, ফাংশানের রিহার্সাল কেমন হল?'

দুজনেই বলল, 'ভালো—।'

'গুড—ভেরি গুড।' বলে অনুষ্কার বাবা হাসলেন।

॥ দশ ॥

চাঁদকে দেখে পূর্ণিমা বোঝার উপায় ছিল না, কারণ, আকাশের মেঘ পুরু আড়াল তৈরি করেছিল। গতকাল থেকেই বৃষ্টির আশা তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু বৃষ্টি এখনও সবাইকে অপেক্ষায় রেখেছে।

ফেস্টিভ্যাল হলে রিহার্সাল চলছিল। যাদের হাজির থাকার কথা তারা সবাই হাজির। দুটো গ্রুপে ভাগ হয়ে মেয়েরা কাকলি ম্যাডাম আর শম্পা ম্যাডামের কাছে তালিম নিচ্ছিল। রবিনা ম্যাডাম একপাশে বসে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'র পাতা ওলটাচ্ছিলেন আর মাঝে-মাঝে কয়েকটা সাদা পাতায় কী যেন টুকে নিচ্ছিলেন।

বড়দি আজ আসেননি, তবে ওঁর চালু করে দেওয়া টিফিন আর চায়ের নিয়মটা পালটায়নি।

আজও যথারীতি অনুষ্কা চা-টিফিন খায়নি। 'বাইরের জিনিস খাওয়া ডাক্তারের বারণ' বলে এড়িয়ে গেছে।

ও একটা কাগজ হাতে ধরে বসেছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' কবিতাটা লেখা। রবিনা ম্যাডাম ওকে এই কবিতাটা তৈরি করতে বলেছেন।

রিহার্সালের জন্য সামান্য হট্টগোল চলছিল। তার মধ্যে হঠাৎই একটা শব্দ সমর্পিতার কানে গেল। হলের টিনের চালে একটা জোরালো শব্দ হয়েছে। বোধহয় বড় মাপের কোনও গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে।

সম্পি বোধহয় ওর ডাকাবুকো স্বভাবের পুরোটা ছাড়তে পারেনি। আর তার সঙ্গে ওর শখের গোয়েন্দা হয়ে ওঠার শখ। তাই ও চট করে উঠে দাঁড়াল। ওর ঢাউস স্কুল-ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল হলের বাইরে।

ইলিনা ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল। ও অনুষ্কাকে বলল, 'যাই, কী ব্যাপার

একবার দেখে আসি—।' তারপর উঠে রওনা হল।

হলের বাইরে বেশ কয়েকটা আলো লাগানো, কিন্তু উঁচু চালের কাছটায় অন্ধকার। চালের ওপরে গাছের ডালপালা আর পাতা ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু তারই মধ্যে কী যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, গাছের ডাল আর পাতা সরিয়ে খুব ক্ষিপ্রভাবে এদিক থেকে ওদিক চলাফেরা করছে।

সম্পিকে দেখতে পেল ইলিনা। ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছে।

রনিতা ম্যাডামের সঙ্গে টিচার্স রুমের সেই ঘটনার পর থেকে সম্পির একটা ব্যাপার ইলিনা লক্ষ করেছে : সম্পি কখনও ওর স্কুল-ব্যাগটা কাছ-ছাড়া করে না।

ইলিনা সম্পির কাছে গিয়ে দাঁড়াল : 'কিছু দেখতে পেলি?'

'হ্যাঁ—কিছু একটা হলের চালের ওপরে ঘোরাফেরা করছে।'

'বোধহয় ভাম-টাম কিছু হবে।'

ইলিনা এ-কথা বলল কারণ, স্কুল চত্বরে মাঝে-মাঝে ভাম দেখা যায়।

ওর কথার উত্তরে সম্পি বলল, 'হ্যাঁ, ভাম হতে পারে। তবে প্রবলেমটা হল ভামটা আমাদের মতো স্কুল-ড্রেস পরে রয়েছে।'

ইলিনা কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল সম্পির দিকে। তারপর মোবাইল ফোন উঁচিয়ে ধরে বলল, 'অনুষ্কাকে ফোন করে ডাকব?'

'না, না—এখনও সেরকম কিছু সিচুয়েশান হয়নি।' সম্পি হাত নেড়ে বারণ করল : 'তা ছাড়া অন্য সবাই সন্দেহ করতে পারে। তারপর রনিতা ম্যাডাম জানতে পারবেন...। চল্, ফিরে যাই।'

ওরা দুজন হলে ফিরে চলল।

সম্পি বলল, 'রনিতা ম্যাডামের সঙ্গের দুটো মেয়েকে আমরা চিনতে পারিনি। তা ছাড়া এর মধ্যে কারও ঘাড়ে ওরা কামড় বসিয়েছে কি না কে জানে! সংখ্যাটা তা হলে তিন থেকে আরও বেড়ে যাবে....।'

ইলিনার অনুষ্কার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল, পূর্ণিমার রাতে ওই পিশাচগুলো পাগলের মতো হয়ে ওঠে। আজ ওরা একটা কিছু করবেই। অনুষ্কাকে ছাড়া আর কাউকে ওরা ভয় পায় না। ওরা এখন বোধহয় সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

ইলিনা আর সমর্পিতা ফেস্টিভ্যাল হলে ঢুকে পড়ল। অনুষ্কা আর সজনীর কাছে গিয়ে বসে পড়ল।

সম্পি চাপা গলায় চালে শব্দ হওয়ার ব্যাপারটা ওদের বলল।

একটু পরেই সম্পি বলল, 'অ্যাই, আমাকে টয়লেটে যেতে হবে।' ও ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে-সঙ্গে বাকি তিনজনও উঠে পড়ল, বলল, 'চল আমরাও যাই—।'

অনুষ্কা রবিনা ম্যাডামের কাছে গিয়ে চাপা গলায় টয়লেটে যাওয়ার পারমিশান নিল। তারপর ওরা চারজন আবার বেরিয়ে এল হলের বাইরে।

আকাশে এখনও মেঘ। চাঁদ মেঘের আড়ালে থাকলেও চাঁদের ঘোলাটে জ্যোতি দেখা যাচ্ছে। বাতাস বেশ জোরে বইছে। বড়-বড় গাছের পাতা এলোমেলো নড়ছে, পাতায়-পাতায় ঘষা লেগে খসখস শব্দ হচ্ছে।

ফেস্টিভ্যাল হল থেকে বেরিয়ে প্রায় পনেরো-কুড়ি মিটার দূরে টয়লেট। জায়গাটা স্কুল-বিল্ডিং-এর পিছনদিক। টয়লেটের বাঁ-দিকে রেলিং ঘেরা বাগান। আর ডানদিকে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি।

এই টয়লেটটা সাধারণত তালা দেওয়া থাকে। এখন রিহার্সাল চলছে বলে বড়দির নির্দেশে তালা খুলে দেওয়া হয়েছে। মাঠে যখন প্যান্ডেল বেঁধে স্কুলের কোনও ফাংশান-টাংশান হয় তখন এই টয়লেটটা গেস্টদের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

ওরা চারজন টয়লেটের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ঝিলমিল লাগানো বিশাল দরজা—প্রায় দেড়মানুষ উঁচু। তিনটে সিঁড়ির ধাপ উঠে তারপর টয়লেটে ঢুকতে হয়।

সম্পি বলল ও আগে যাবে। তখন ইলিনা বলল, 'তোর ব্যাগটা আমার কাছে দিয়ে যা—।'

তাতে ও স্পষ্ট জবাব দিল, 'না রে, ব্যাগ আমার সঙ্গে থাক...।' তারপর দরজা ঠেলে ঢুকে গেল।

ব্রিটিশ আমলের টয়লেট। তার সিলিং যেমন উঁচু, আকারও তেমনি বিশাল। তবে মাত্র একজন ব্যবহার করতে পারে।

টয়লেটে চল্লিশ ওয়াটের দুটো বাল্‌ব জ্বলছে। বাঁ-দিকের দেওয়ালে বড় ওয়াশ বেসিন। তার ওপরে বিরাট মাপের বেলজিয়ান আয়না। তার পাশে একটা প্রকাণ্ড বাথটাব। লম্বায় প্রায় আট ফুট হবে। তার সাদা রং অনেক জায়গায় চটে গিয়ে জং ধরা লোহা বেরিয়ে পড়েছে।

ডানদিকে বড় মাপের ইউরিনাল কিউবিক্‌ল, আর তার পাশে একটা ছোট ঘর হল ল্যাট্রিন।

টয়লেটের দেওয়ালে-দেওয়ালে ঝুল-কালি আর মাকড়সার জাল দেখে বোঝাই যায় এটা খুব কম ব্যবহার হয়।

টয়লেটের দরজা বন্ধ করল সম্পি। তারপর দু-পাল্লার ঝিলমিলের ওপরে কাঠের লক আটকে দিল।

এবার ও টয়লেটের প্রতিটি আনাচকানাচ খতিয়ে দেখে নিল যে, টয়লেটে সত্যিই ও একা।

সিলিং-এর দিকে তাকাল সম্পি। অনেক উঁচুতে চার দেওয়ালে চারটে বড় মাপের ভেন্টিলেটার। তার চারপাশে মোটা-মোটা ঝুল জমে আছে।

সম্পির একটু ভয়-ভয় করছিল। ও ব্যাগটা শুকনো মেঝেতে নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি ইউরিনাল কিউবিক্‌ল-এ ঢুকল। তখনই যেন একটা ছোট্ট কাশির শব্দ শুনতে পেল।

ও গলা বাড়িয়ে বাইরেটা আবার দেখে নিল। কেউ নেই।

ভাগ্যিস ও ভয়ে চিৎকার করে ওঠেনি! স্কুলে ডাকাবুকো বলে যার পরিচয় তাকে সবাই ভিতুর ডিম বলে ডাকুক এটা ও কিছুতেই চায় না।

কিন্তু ইউরিনাল কিউবিক্‌ল থেকে ও যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন টয়লেটে ও একা নয়। টয়লেটের দরজার কাছে রনিতা ম্যাডাম দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওঁর মুখটা এখনও পালটে যায়নি, কিন্তু দু-চোখে সাদা আলো জ্বলছে।

ম্যাডামের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্কুল ইউনিফর্ম পরা একটা মেয়ে। সম্পি ওর নাম জানে না, তবে মুখটা চেনে। যতদূর মনে পড়ছে, মেয়েটা ক্লাস নাইনের 'সি' সেকশানে পড়ে। ওর চোখেও সাদা আলো ধকধক করে জ্বলছে।

যতটা ভয় পাওয়ার কথা সম্পি ততটা ভয় পেল না। কারণ, দরজার বাইরে ওর তিন বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে আবার অনুষ্কা রয়েছে।

কিন্তু এই পিশাচ দুটো কোথায় লুকিয়ে ছিল? সম্পি তো এদের খুঁজে পায়নি! তা হলে কি ল্যাট্রিনের ছাদের ওপরে লেপটে শুয়ে ছিল?

সম্পি চিৎকার করার কথা ভাবল। কিন্তু দরজার ঠিক বাইরেই যখন তিন বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে তখন চিৎকার না করে ওদের স্বাভাবিক গলায় ডাকলেই হয়। তা হলে ওরা বুঝবে, সম্পি ভিতু নয়।

সম্পি 'ইলিনা! ইলিনা!' বলে ডেকে উঠল। ডাকটা সম্পির অনিচ্ছা

সত্ত্বেও চিৎকারের মতো হয়ে গেল।

কিন্তু কোনও সাড়া পেল না।

পিশাচ দুটো চাপা খিলখিল হাসিতে ঢলে পড়ল। গোপন রসিকতায় এ ওর গায়ে ঠেলা মারতে লাগল। রনিতা ম্যাডাম ওঁর ছাত্রীর যেন ইয়ার-দোস্ত হয়ে গেছেন।

'ওরা কেউ নেই রে। ওরা চলে গেছে।' হেসে বললেন রনিতা। ওঁর গলাটা অস্বাভাবিকরকম মিহি শোনাল : 'আমাদের মতো আর-একজন ওদের মিছে কথা বলে ডেকে নিয়ে গেছে। তোর পাহারা থেকে সরিয়ে দিয়েছে।'

পিশাচের কথা বিশ্বাস করল না সমর্পিতা। ও আবার ইলিনা আর অনুষ্কার নাম ধরে জোরে-জোরে ডেকে উঠল—একবার, দু-বার, তিনবার।

না, কেউ সাড়া দিল না। সম্পির গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

পিশাচ দুটো আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। কাচের চুড়ির সঙ্গে কাচের চুড়ি ঠোকাঠুকি লাগল যেন। তারপর আহ্লাদে আটখানা হয়ে এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে লাগল।

'কেউ নেই—' আঙুল ঘুরিয়ে ব্যঙ্গের গলায় বললেন রনিতা, 'তুই এখন আমাদের। তোর বন্ধু অনুষ্কা—ওই ন্যাকা ভ্যাম্পায়ারটা—ওকেও আজ আমরা খতম করব। ভ্যাম্পায়ার, কিন্তু মানুষ ধরা পছন্দ করে না। ন্যাকাষষ্ঠী! বেড়াল বলে মাছ ছোঁব না! তার উপর আমাদের পিণ্ডি চটকানোর প্ল্যান আঁটছে! আজ দেখব কত দৌড়!'

'তোকে আজ কেউ বাঁচাতে পারবে না।' রনিতার সঙ্গী পিশাচটা বলল, 'আজ আমাদের পূর্ণিমা ফেস্টিভ্যাল...।'

সম্পি ঝুঁকে পড়ে ওর ব্যাগ খুলল। একটা জলের বোতল বের করে ছিপি খুলল। ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে।

পিশাচ দুটো বিদ্যুৎঝলকের মতো লাফ দিল। এক লহমায় চলে এল সম্পির কাছে। ওর দুপাশে ঘন হয়ে দাঁড়াল। লম্বা জিভ বের করে ওর ঘাড়-গলা চাটতে লাগল। আর মুখ থেকে জড়ানো গলায় 'আঃ—! আঃ—!' করে লোভের শব্দ বের করতে লাগল।

সমর্পিতার গা ঘিনঘিন করছিল, কিন্তু একইসঙ্গে আরাম কিংবা তৃপ্তির ঝিমুনি লাগছিল। সেই অবস্থাতেই ওর মনে প্রশ্ন জাগল : এই পিশাচগুলো কি সম্মোহন জানে?

রনিতা ম্যাডাম সম্পির হাতের জলের বোতলের দিকে তাকিয়ে নেশা-ধরা গলায় বললেন, 'সম্পি, তোর তেষ্টা পাচ্ছে, তেষ্টা?.....আমাদেরও পাচ্ছে...দারুণ তেষ্টা....তেষ্টা—আ—আ—আঃ....!'

রনিতা ম্যাডামের কথা শেষ হওয়ার আগেই জলের বোতলটা ওঁর মাথায় উপুড় করে দিল সম্পি। তাই রনিতার শেষ দিকের 'আঃ!'-টা আরামের শীৎকার থেকে যন্ত্রণার চিৎকারে বদলে গেল।

মানুষের মাথার ওপরে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের বোতল উপুড় করে দিলে যে-দশা হয় রনিতা ম্যাডামের দশা তার চেয়েও দশগুণ খারাপ হয়ে গেল।

ওর শরীর গাঢ় ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। গরম তেলের ওপর জলের ফোঁটা পড়লে যেরকম চড়বড়-চড়বড় শব্দ হয় সেরকম শব্দ হতে লাগল। তার সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণার মরণ আর্তনাদ।

ধোঁয়াটে রনিতা ম্যাডাম কেমন যেন দলা পাকিয়ে খসে পড়ল মেঝেতে।

বৃষ্টির জলের সত্যি-সত্যি এত শক্তি!

সম্পি তাজ্জব হয়ে গেল। এই পিশাচটাকে নিকেশ করার জন্য ও কতদিন ধরে বৃষ্টির জল জমিয়ে রেখেছিল! দুটো প্লাস্টিকের বোতলে সেই জল ভরে ও সেই কবে থেকে স্কুল-ব্যাগে বোতলগুলো বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে!

আজ সেটা কাজে এল।

ধেড়ে পিশাচ তো পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে, কিন্তু কচিটা?

সেটা তখন সম্পিকে জাপটে ধরে ইস্পাতের দাঁতের পাটি ফাঁক করেছে। এবং সেই ধারালো দাঁত বসিয়ে দিতে চাইছে সমর্পিতার গলায়।

সম্পি এক ভয়ংকর চিৎকার করে উঠল—অনেকটা যুদ্ধের ডাকের মতো। তারপর বোতলে যে-সামান্য জল ছিল সেটা ছুড়ে দিল দ্বিতীয় পিশাচের গায়ে।

পিশাচটার গা থেকে ধোঁয়া বেরোল। ওটা চকিতে দু-পা পিছিয়ে গেল সম্পির কাছ থেকে।

সমর্পিতা এইটুকু সময়ই চাইছিল। যন্ত্রের মতো নির্ভুল দ্রুতগতিতে ও ব্যাগ থেকে দ্বিতীয় জলের বোতলটা বের করে নিল। একলাফে আহত পিশাচটার কাছে পৌঁছে গেল। ছিপি খুলে বোতলের জল ঢেলে দিল ওটার মাথায়।

ধোঁয়া। চড়বড় শব্দ। যন্ত্রণার চিৎকার।

পিশাচটা পড়ে গেল মেঝেতে। ধোঁয়ায় মাখামাখি হয়ে ছটফট করতে লাগল।

দুটো ধোঁয়ার কুণ্ডলীকে পিছনে ফেলে দরজার দিকে পাগলের মতো ছুট লাগাল সম্পি। একইসঙ্গে খ্যাপাটে চিৎকার করতে লাগল। হাতের খালি বোতলটা এক ঝটকায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে টয়লেটের দরজার কাছে পৌঁছে গেল। তারপর ছিটকিনি খুলে সোজা বাইরে।

সম্পি বাইরে এলেও ওর চিৎকার থামেনি। চিৎকার করতে-করতে ও ছুটে গেল ফেস্টিভ্যাল হলের দরজার দিকে।

ওর চিৎকার শুনে অনেকেই বাইরে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু দরজার কাছে ভিড় করে সবাই দাঁড়িয়ে। পুরোনো ঘটনার কথা মনে রেখে কেউই এগোতে সাহস পায়নি।

সম্পি ছুটতে-ছুটতে এসে কাকলি ম্যাডামকে দেখতে পেয়ে ওঁর ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিকৃত গলায় হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'পিশাচ! পূর্ণিমা! পিশাচ! টয়লেটে। রনিতা....রনিতা ম্যাডাম....পিশাচ!'

এটুকু শুনেই কাকলি ম্যাডাম চোখ কপালে তুলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

সম্পি টাল সামলাতে না পেরে আর-একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল—কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিল।

মেয়েরা কাকলি ম্যাডামকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেল।

অন্যরা সমর্পিতাকে ঘিরে ধরে হাজারটা প্রশ্ন করতে লাগল।

ও বড়-বড় শ্বাস টেনে অনেক কিছু বলতে চাইল, কিন্তু ওর মুখ দিয়ে জড়ানো এলোমেলো শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধাতস্থ হয়ে সম্পি টয়লেটের ভয়ংকর ঘটনা সবাইকে খুলে বলল। তারপর জিগ্যেস করল, ইলিনা, সজনী, অনুষ্কা ওরা কোথায়।

কেউই কিছু বলতে পারল না। সবাই শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। ভয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে রইল।

হঠাৎই একটি মেয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গেই তো ওরা তিনজন হল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর তো আর দেখিনি—।'



...ওরা তিনজনে চমকে উঠল, শব্দ লক্ষ্য করে তাকাল...

তা সত্ত্বেও সম্পির চোখ ভিড়ের মধ্যে তিন বন্ধুকে খুঁজতে লাগল। কোথায় গেল ওরা? ওদের ফোন করার কোনও উপায় নেই, কারণ মোবাইল ফোন ও টয়লেটে ব্যাগে ফেলে এসেছে।

সম্পি এতক্ষণে ভয় কাটিয়ে দম ফিরে পেয়েছিল। ও এদিক-ওদিক তাকিয়ে জুতসই একজন সঙ্গী খুঁজতে লাগল। ইলিনাদের খোঁজার জন্য কয়েকজনকে ও সঙ্গে নিতে চায়।

ও সামনে দাঁড়ানো দুজন মেয়েকে বলল, 'আমি ইলিনাদের খুঁজতে যাব। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে?'

ওর কথায় দুজনের জায়গায় ছ'জন ওর কাছে এগিয়ে এল : 'চলো, আমরা যাব...।'

সম্পির চোখ সাহসী রবিনা ম্যাডামকে খুঁজল কিন্তু দেখতে পেল না।

কয়েকজনকে জিগ্যেস করে জানল, মিনিট পনেরো-কুড়ি আগে ক্লাস নাইনের একটি মেয়ে এসে রবিনা ম্যাডামকে কোথায় যেন ডেকে নিয়ে গেছে।

সম্পি আর দাঁড়াল না। ওর মন কু-ডাক ডাকতে লাগল। ওর মনে হল, রবিনা ম্যাডাম, ইলিনা, সজনীদের খুব বিপদ। কারণ আজ পূর্ণিমা। অনুষ্কা কি পারবে সবাইকে বিপদ থেকে বাঁচাতে?

সম্পি পিচের রাস্তা ধরে বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের দিকে রওনা হল। প্রায় সাত-আটজন মেয়ে দল বেঁধে ওর সঙ্গী হল। শম্পা ম্যাডাম বারবার সম্পিকে ডাকলেন, অন্ধকারে এসব খোঁজাখুঁজির কাণ্ড থামাতে বললেন। কিন্তু সম্পির আজ কোনও বারণ না শোনার দিন।

নিরুপায় শম্পা ম্যাডাম তখন মোবাইল ফোন নিয়ে বড়দিকে ফোন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সম্পিরা তখন হইহই করে এগিয়ে চলেছে। থেকে-থেকে ইলিনা, সজনী আর অনুষ্কার নাম ধরে ডাকছে।

আকাশের চাঁদের দিকে সম্পির চোখ গেল।

মেঘের আড়াল সরিয়ে ফ্যাকাশে হলদে চাঁদ কখন যেন বেরিয়ে এসেছে।

॥ এগারো ॥

উদভ্রান্তের মতো যে-মেয়েটি ওদের কাছে ছুটে এল ইলিনারা ওর মুখ চেনে, কিন্তু নাম জানে না। ক্লাস টেন-এর-ই অন্য কোন একটা সেকশানে যেন পড়ে।

ইলিনা, সজনী আর অনুষ্কা টয়লেটের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সমর্পিতার বেরিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল।

মেয়েটা হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'তোমাদের তিনজনকে....রবিনা ম্যাডাম ...এক্ষুনি ডাকছেন। তোমাদের নাম ইলিনা, সজনী আর....আর অনুষ্কা তো?'

ওরা মাথা নাড়ল। হ্যাঁ।

'তোমাদের...তোমাদের রবিনা ম্যাডাম...এক্ষুনি ডাকছেন...খুব দরকার।'

ল্যাম্পপোস্টের আলোয় যতটুকু দেখা গেল তাতে 'খুব দরকার' ভাবটা মেয়েটির চোখে-মুখেও ফুটে উঠেছিল।

'ম্যাডাম কোথায়? ফেস্টিভ্যাল হলে?'

'না, ম্যাডাম হল থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পাসের পেছনের দিকে গেলেন। তোমাদের তিনজনকে তাড়াতাড়ি সেখানে যেতে বললেন....।'

ইলিনারা ইতস্তত করল। এ ওর দিকে তাকাল। রবিনা ম্যাডাম হঠাৎ ক্যাম্পাসের পিছনদিকে কী করতে গেলেন?

অনুষ্কা বলল, 'ইলিনা, সজনী— তোমরা বরং যাও, আমি এখানে থাকছি।'

মেয়েটি অসহায়ের মতো বলল, 'কিন্তু ম্যাডাম যে তিনজনকেই ডেকেছেন—বলেছেন ভীষণ আর্জেন্ট..।'

তখন অনুষ্কা ওকে বুঝিয়ে বলল, 'আমাদের এক বন্ধু টয়লেটে গেছে। আমরা ইন ফ্যাক্ট ওর জন্যেই ওয়েট করছি। ও বেরোলে আমরা....।'

Scanned by CamScanner

মেয়েটি বেশ বিপন্ন গলায় বলল, 'তা হলে তো খুব প্রবলেমে পড়লাম! ম্যাডাম যেভাবে বললেন....।'

ইলিনা মোবাইল ফোন বের করে সমর্পিতাকে ফোন করতে লাগল। রিং বেজে গেল, কিন্তু কেউ ফোন ধরল না। তখন ইলিনা ফোন কেটে দিল।

'ফোন বেজে যাচ্ছে। ও ধরছে না—।'

সজনী বলল, 'ওর ফোনটা নিশ্চয়ই সাইলেন্ট মোডে আছে—।'

অনুষ্কা বলল, 'ঠিক আছে। তোমরা দুজন যাও—নিশ্চয়ই ওখানে কোনও প্রবলেম হয়েছে। আমি এখানে থাকছি। সম্পি টয়লেট থেকে বেরোলে তারপর আমি যাব। কোনও ভয় নেই—।'

'ভয়? ভয় কীসের?' অন্য মেয়েটি কৌতূহলে জানতে চাইল।

ইলিনা আর সজনী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না—এমনি। চলো, যাই...।'

ওরা দুজনে যখন মেয়েটির সঙ্গে এগোচ্ছে তখন অনুষ্কা ডেকে বলল, 'কোনও প্রবলেম হলেই আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে ফোন কোরো। সম্পি বেরোলেই আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি—।'

'ঠিক আছে।' বলে ওরা জোর পায়ে হাঁটা দিল।

দুপাশে গাছপালা, মাঝখান দিয়ে পিচের রাস্তা। ল্যাম্পপোস্টের হলদে আলো এখানে-সেখানে ছিটকে পড়েছে। অন্ধকার আর আলো দাবার ছক তৈরি করেছে যেন।

রিহার্সালের গানের আওয়াজ কানে আসছে। তার সঙ্গে ঘুঙুরের শব্দ।

অনুষ্কা আনমনাভাবেই আকাশের চাঁদের দিকে তাকাল। কী সুন্দর গোল আর স্পষ্ট। ওর ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার কথা মনে পড়ে গেল। ছবির চাঁদটা মেঘে ঢাকা পড়েছে কি না কে জানে! প্রকৃতির সঙ্গে ওই ছবিটা সবসময় মেলে না।

চাঁদের দিকে তাকিয়ে অনুষ্কার কেমন ঘোর লেগে গেল। ও অপলকে তাকিয়ে নিশিনাথকে দেখতে লাগল।

হঠাৎই অনুষ্কার হাতের মুঠোয় ধরা মোবাইল ফোন থরথর করে কেঁপে উঠল। ও চমকে উঠে ফোনের পরদার দিকে তাকাল।

ইলিনা।

ফোন ধরতেই ইলিনার বিপন্ন গলা শোনা গেল। শুধু বিপন্ন নয়, ওর গলা কাঁপছে।

'অনুষ্কা, শিগগির এসো—সর্বনাশ হয়েছে!'

'তোমরা কোথায়?'

'পিছনদিকের পাঁচিলের কাছে—যেখানে তুমি আর আমি কোকিল দেখতে গিয়েছিলাম। সেই ইটের পাঁজা....।'

আর শোনার দরকার মনে করল না অনুষ্কা। ফোন কেটে দিয়ে পিছনের বাউন্ডারি ওয়ালের দিকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটতে শুরু করল।

আলো আর অন্ধকারে ওর শরীরটা একবার দেখা যাচ্ছিল, একবার মিলিয়ে যাচ্ছিল। যেন ওর ছুটন্ত শরীরটা জ্বলছে-নিভছে।

ছুটতে-ছুটতে অনুষ্কার মনে হল, টয়লেটের দিক থেকে একটা মিয়োনো ডাক যেন ভেসে এল। ইলিনার নাম ধরে কেউ ডেকে উঠল যেন।

কিন্তু ওর সামনে দু-বন্ধুর ডাক, পিছনে এক বন্ধুর ডাক। তাই অনুষ্কা দৌড় থামাল না—ছুটতেই থাকল। সেই অবস্থাতেই ও লম্বা-লম্বা লাফ দিয়ে শূন্যে ভেসে উঠে অলৌকিক গতিতে দূরত্ব কমাতে লাগল।

মনে হচ্ছিল যেন ও উড়ে চলেছে। অন্ধকার কিংবা গাছপালা ওর গতি রুখতে পারছিল না। ওকে এই অবস্থায় দেখলে যে-কেউ স্তম্ভিত হয়ে যেত, ভয় পেত।

অকুস্থলে পৌঁছতে অনুষ্কার সময় লাগল আট সেকেন্ডেরও কম। রাস্তা ছেড়ে গাছপালার ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

ওই তো, পুরোনো টিন, কাঠ আর অ্যাসবেস্টস। তার পাশে ইটের পাঁজা। ইটের পাঁজার ওপরে শুয়ে আছে ওরা দুজন কে? শুয়ে-শুয়ে ছটফট করছে? গায়ে স্কুল-ড্রেস?

জায়গাটা অন্ধকার। গাছপালার পাতার আড়াল থাকায় চাঁদের আলোও সেখানে ঢোকেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভ্যাম্পায়ার মেয়ের দেখতে কোনও অসুবিধে হল না।

চিৎ হয়ে শুয়ে আকুলিবিকুলি করছে ইলিনা আর সজনী। ওরা যে চিৎকার করতে পারছে না তার কারণ স্কুল- ড্রেস পরা একটা পিশাচ

ওদের ওপর উপুড় হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। পিশাচটার মুখ ভয়ংকর, চোখ জ্বলছে, ইস্পাতের দাঁত ঝিলিক দিচ্ছে।

কিন্তু রবিনা ম্যাডাম কোথায়?

প্রশ্নটা অনুষ্কার মনে ঝলসে গেলেও একইসঙ্গে ও প্রতিরক্ষার কাজ শুরু করল।

ও ইলিনাদের কাছ থেকে প্রায় পাঁচ-ছ' হাত দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই দূরত্বটাকে ও মোটেই কমাতে চেষ্টা করল না। ওখানে দাঁড়িয়েই ওর ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল।

হাতটা পলকে রবারের মতো লম্বা হয়ে গেল। একইসঙ্গে হাতের পেশি, শিরা-উপশিরা সব দেখা গেল। যেন অনুষ্কার হাতটা স্বচ্ছ কাচের তৈরি।

পিশাচটা ততক্ষণে ইলিনার গলার খাঁজে কামড় বসিয়েছে। আর ঠিক তখনই অনুষ্কার হাতের চেটোতে কতকগুলো কাঁটা গজিয়ে গেছে—ছুচলো ইস্পাতের কাঁটা।

সেই হাতে বজ্রমুঠিতে পিশাচটার ঘাড় চেপে ধরল অনুষ্কা। শরীর থেকে যেমন করে জোঁক ছাড়ায় সেভাবে পিশাচটাকে ইলিনার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিল, এক হ্যাঁচকায় টেনে নিল নিজের কাছে।

ইলিনা আর সজনী এবার প্রাণপণ চিৎকার জুড়ে দিল। সেই চিৎকারে গাছপালার ঘুমন্ত পাখিরা জেগে উঠে ডাকতে লাগল, ওড়াউড়ি শুরু করল।

ইলিনারা টের পেল দারচিনির গন্ধে জায়গাটা ভরে গেছে।

ইলিনার গলা থেকে রক্ত পড়ছিল, মাথা টলে যাচ্ছিল। ও কোনওরকমে উঠে বসল। তাকাল অনুষ্কার দিকে।

সজনীও তাকাল।

ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে ইলিনার প্রিয়তম ভ্যাম্পায়ার। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে!

অনুষ্কার হাতের মুঠোয় পিশাচটার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ওটা হাঁ করে বাতাস টানার চেষ্টা করছিল। যন্ত্রণার চিৎকার করছিল। ইস্পাতের দাঁতের পাটি ঝকঝক করছে। আর তার ফাঁকে সাপের মতো কুণ্ডলী

পাকানো একটা কালো রঙের জিভ। সেটা কখনও-কখনও লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসছে বাইরে।

অনুষ্কার শক্তি এতটাই যে, পিশাচটা তার কানাকড়িও ডিঙোতে পারছিল না। তাই জেতার চেষ্টা করতে-করতে ওটা কাহিল হয়ে পড়ল।

অনুষ্কা মোবাইল ফোন ফেলে দিয়ে বাঁ-হাতে পিশাচটার নাক চেপে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত একটা গোঙানির শব্দ করে পিশাচটার মাথা কাত হয়ে গেল একপাশে।

অনুষ্কা ওটাকে ছেড়ে দিল। ওটার নিষ্প্রাণ শরীরটা ভেজা কাপড়ের মতো খসে পড়ল মাটিতে। পড়েই রইল।

অনুষ্কার ডানহাতটা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

ইলিনা আর সজনী থরথর করে কাঁপছিল। ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিল।

এই তা হলে অনুষ্কার গোপন শক্তি! অনুষ্কা না থাকলে ইলিনারা আজ বাঁচত না।

কৃতজ্ঞতার আবেগে ইলিনার কান্না পেয়ে গেল। একইসঙ্গে গলার অসহ্য যন্ত্রণা ওকে অজ্ঞান করে দিতে চাইছিল। ও সজনীকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রইল।

সজনীর অবস্থা তখন সাংঘাতিক। ওর বুক ধড়াস-ধড়াস করছিল। আধো-অন্ধকারে এইমাত্র ও কী দেখল? ওদের বন্ধু অনুষ্কা! সে কেমন পালটে ভয়ংকর হয়ে গেল! অমানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অমানুষিক লড়াই করল!

সজনীর বুক ঠেলে কান্না উথলে উঠছিল। একইসঙ্গে একটা অচেনা ভয় ওকে অবশ করে দিচ্ছিল।

ইলিনা আর সজনী নেমে এল ইটের পাঁজা থেকে। দুজনেই ভয়ে কাঁপছে, কাঁদছে।

ইলিনার স্কুল-ড্রেস রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ও সজনীকে আঁকড়ে ধরে পা ফেলছিল। যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠছিল।

অনুষ্কা ছুটে গিয়ে ওদের জাপটে ধরল। ওরা তিনজনেই হাঁপাচ্ছিল। কাঁদছিল। আর সজনী শিউরে উঠছিল।

একটু পরে অনুষ্কা সজনীকে বলল, 'শিগগির সম্পিকে একটা ফোন

করো....।' কথাটা বলেই ও ইলিনার গলায় নিজের রুমালটা চেপে ধরল। যে করে হোক রক্তটা বন্ধ করা দরকার।

সজনী কান্না-ভাঙা কাঁপা গলায় বলল, 'আমাদের দুজনের কারও মোবাইল নেই। গণ্ডগোলের সময় কোথায় ছিটকে পড়েছে জানি না...।'

'আমার ফোন থেকে ফোন করো। ওই তো আমার ফোন ওখানে পড়ে আছে।'

সজনী এগিয়ে গেল সামনে। অন্ধকারে হাতড়ে অনুষ্কার মোবাইলটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল।

সম্পিকে ও ফোন করতে যাবে, তখনই অনুষ্কা জিগ্যেস করল, 'আমরা যে পিশাচটাকে খতম করলাম সেটাই কি টয়লেটের ওখানে আমাদের ডাকতে গিয়েছিল?'

সজনী নাক টেনে-টেনে সহজ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'না, ও ভালো মেয়ে। এখানে এসে দূর থেকে জায়গাটা আমাদের দেখিয়ে দিয়েই ও ছুটে আবার ফেস্টিভ্যাল হলে চলে গেছে। আমরা এখানে এসে রবিনা ম্যাডামকে খুঁজছি, তখনই ওই শয়তান পিশাচটা এগিয়ে এল। তারপর....।'

সজনী কথা বলছিল আর একইসঙ্গে সম্পির নম্বর ডায়াল করে মোবাইল ফোনটা কানে চেপে ধরেছিল।

রিং হয়ে যাচ্ছে। ফোন কেউ ধরছে না।

সে-কথাই ও বলল অনুষ্কাকে।

অনুষ্কা বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওঃ, আবার সেই সাইলেন্ট মোড! শিগগিরই চলো, ইলিনাকে এখুনি ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হবে। কুইক—।'

ইলিনা অনুষ্কার গায়ে প্রায় এলিয়ে পড়েছিল। চোখ বুজে 'ও—ওঃ! ও—ওঃ!' শব্দ করে কাতরাচ্ছিল।

ওকে যে করে হোক সুস্থ করে তুলতে হবে। অনুষ্কা ভাবল। আরও গাঢ় করে ইলিনাকে জাপটে ধরল ও।

সজনীকে ডেকে নিয়ে ও এগোতে যাবে তখনই ওর মনে পড়ল রবিনা ম্যাডামের কথা। যাঁর নাম করে সেই মেয়েটা ওদের ডেকে নিয়ে এল সেই রবিনা ম্যাডাম কোথায়? আর কোন আর্জেন্ট কাজের জন্য তিনি ওদের তিনজনকে তড়িঘড়ি ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

সজনীকে রবিনা ম্যাডামের কথা জিগ্যেস করতেই ও বলল, 'জানি না। এখানে এসে রবিনা ম্যাডামকে আমরা একবারও দেখিনি। যখন ম্যাডামকে খোঁজাখুঁজি করছি তখন ইটের পাঁজার আড়াল থেকে ওই ভয়ংকর পিশাচটা আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর তো তুমি এলে....।'

ইলিনা যন্ত্রণায় রুদ্ধ গলায় কোনওরকমে বলল, 'অনুষ্কা, রবিনা ম্যাডামের কোনও বিপদ হয়নি তো?'

সজনী সে-কথায় সায় দিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'আমিও ঠিক এই কথাটাই বলছিলাম। রবিনা ম্যাডামের কোনও বিপদ হয়নি তো!'

'না রে, আমার কোনও বিপদ হয়নি।' উত্তর দিলেন রবিনা ম্যাডাম নিজেই, 'এখন আমার আর কোনও বিপদের ভয় নেই....।'

ওরা তিনজনে চমকে উঠল। শব্দ লক্ষ করে তাকাল।

কাছেই একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে রবিনা ম্যাডামের দেহটা লেপটে আছে। মাটি থেকে প্রায় চার-পাঁচ হাত উঁচুতে ওঁর শরীরটা উলটোভাবে শূন্যে ঝুলছে। পা ওপরে। মাথা নীচের দিকে।

বোধহয় অন্ধকারে ঢাকা কোনও জুতসই ডালে রবিনা পা দুটো আঁকশির মতো আটকে রেখেছেন।

রবিনার শরীর থেকে একটা নীলচে আভা বেরোচ্ছে। সেই আভার জন্যই ওঁকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু উলটো হয়ে থাকার জন্য স্পষ্টভাবে চেনা যাচ্ছে না।

রবিনার গাল বসে গিয়ে চোয়ালটা সামনে বেরিয়ে এসেছে। চোখ দুটো অন্ধকার কৃষ্ণগহ্বর। আর তার কেন্দ্রে সার্চলাইটের মতো উজ্জ্বল সাদা আলোর বিন্দু।

'তেষ্টায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে রে...অসম্ভব পাগল করা তেষ্টা।' গাছের গায়ে উলটো হয়ে ঝুলে থাকা পিশাচটা বলল, 'সেদিন রনিতাদি কী যে কামড় বসাল ঘাড়ে, তারপর থেকেই যত অশান্তি আর ভোগান্তির শুরু। তোরা তো আর বুঝবি না, পূর্ণিমার তেষ্টা কী জিনিস! আয়, তোরা কাছে আয়...আয়...।'

এইসব কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে রবিনার শরীরটা পেন্ডুলামের

অল্প-অল্প দুলতে লাগল। ঠিক যেন হাওয়ায় দুলছে। আর ওঁর মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

ইস্পাতের দাঁতের পাটি দেখা গেল। তার ফাঁক দিয়ে একটা লম্বা কালো জিভ সাপের মতো সড়সড় করে বেরিয়ে এল। ঝুলে পড়ল নীচের দিকে। তারপর সেই দেড়ফুট লম্বা জিভটা নড়তে লাগল, দুলতে লাগল।

পিশাচটার চোখের দৃষ্টিতে বোধহয় সম্মোহন ছিল। কারণ, ইলিনা আর সজনী উলটোভাবে ঝুলে থাকা রবিনার নীল আলো মাখা দেহের দিকে এগিয়ে যেতে চাইল।

অনুষ্কা ওদের হাত ধরে টেনে আটকে রাখল। চিৎকার করে বলল, 'যেয়ো না—এখানে চুপ করে দাঁড়াও! যেয়ো না! আমার কথা শোনো—!'

হঠাৎই দারচিনির গন্ধে বাতাস মিষ্টি হয়ে গেল। এক ঝটকায় ইলিনা আর সজনীকে ছিটকে ফেলে দিল অনুষ্কা। তারপর ওর ডানহাত চোখের পলকে লম্বা হয়ে ছোবল মারল রবিনা ম্যাডামের গলায়। এবং একটানে পিশাচটাকে গাছ থেকে ছাড়িয়ে নিল।

ইলিনা আর সজনী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ওদের বন্ধুর অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখছিল। মনে হচ্ছিল, ওদের চোখের সামনে যা-যা ঘটে চলেছে সেগুলো বাস্তব নয়, একটা গাঁজাখুরি সিনেমা।

সেই 'সিনেমা'-য় অনুষ্কার হাতের ইস্পাতের কাঁটাগুলো পিশাচটার গলায় আমূল গেঁথে গেল। ওর হাতের টানে পিশাচটা রবারের সুতোয় বাঁধা বলের মতো ছিটকে চলে এল অনুষ্কার কাছে।

পিশাচটা যন্ত্রণার হাহাকার তুলছিল। মাথাটা এপাশ-ওপাশ নাড়ছিল। অনুষ্কা বাঁ-হাতে খপ করে পিশাচটার নাক টিপে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল পিশাচটার মরণ গোঙানি। বারবার হাঁ করে বাতাস নিতে চাইল।

একটু পরেই ওটার সব লড়াই শেষ হয়ে গেল। সব তেষ্টা মিটে গেল।

অনুষ্কা ছেড়ে দিতেই ওটা এক টুকরো কাঠের মতো খসে পড়ে গেল মাটিতে।

অনুষ্কার ডানহাতটা আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। ও এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। ঘোর কেটে যেতেই ওর বন্ধুদের কথা মনে

পড়ল। ও ফিরে তাকাল ইলিনার দিকে, সজনীর দিকে। ওদের বিপদে কাজে লাগতে পেরে মনটা ভীষণ ভালো লাগছে। এই ভালো লাগা আগে কখনও ও টের পায়নি।

অনুষ্কা ইলিনাকে তুলে ধরল। তারপর ওকে বুকে জড়িয়ে নিল ঃ 'শিগগির চলো, তোমাকে ডাক্তার দেখাতে হবে...।'

সজনী নিজে থেকেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। ও অনুষ্কার কাছে এসে ওর হাত ধরল। চাপা গলায় বলল, 'থ্যাংক য়ু—।'

ইলিনাও অনুষ্কার কানে-কানে ফিসফিস করে বলল, 'ও যা বলল, তাই....।'

অনুষ্কার কানে এল অনেকের হইচই চিৎকার।

ও চাঁদের দিকে তাকাল। কী স্পষ্ট, কী সুন্দর।

চাঁদকে এই মুহূর্তে ওর ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছে করল।

ঠিক তখনই সম্পির গলা কানে এল। ওদের তিনজনের নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকছে।

॥ বারো ॥

আমি একজন পিশাচ। এ ছাড়া অন্য কোনও পরিচয় আমার নেই।

এখন আমাকে আবার নতুন আশ্রয়ের খোঁজে বেরোতে হবে।

আত্মা যদি অবিনশ্বর হয় তা হলে প্রেতাত্মার অবিনশ্বর হতে অসুবিধে কী! সুতরাং আমি অমর।

তোমার কি মনে নেই, গীতার সাংখ্যযোগে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।' অর্থাৎ, কোনও শস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না। অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না।

তিনি আরও বলেছেন, জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।

তা হলে আমার 'মৃত্যু' হবে কেমন করে?

তাই আকাশে, বাতাসে ধুলোয় মিশে আবার শুরু হোক আমার পথ চলা।

চলতে-চলতে আবার আমাকে খুঁজতে হবে নতুন আশ্রয়। নিতে হবে আবার কোনও নতুন পরিচয়। তারপর আবার বিশ্রাম আর আরাম।

নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে, নতুন করে শুরু হবে আমার নতুন জীবন।

আঃ, ভাবতেই কী তৃপ্তি!